অন্দরের আলো

শ্রীলালমোহন দে, এম-এ

পি. সি. সরকার এণ্ড কোম্পানী
২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রকাশক :
সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ
মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—চিত্রশিল্পী—
শ্রীবিরাজমোহন লস্কর

দেড় টাকা
আশ্বিন, ১৩৪০

PRINTER :- SURES C. DAS. M. A.
ABINAS PRESS
40, MIRZAPUR STREET.
CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত লালমোহন দের রচনাগুলির মধ্যে যাহা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা লেখকের অপূর্ব্ব চিত্ত-প্রসন্নতা ও অকৃত্রিম জীবন-প্রীতি। ছোটগল্পের মাপকাটিতে এগুলিকে মাপা যায় না, কিন্তু সামাজিক চিত্র ও রস-রচনা হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে বলিয়াই আমার ধারণা। প্রথম উদ্যমের সঙ্কোচ ও অনভিজ্ঞতা রহিয়াছে, সত্য, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিশক্তি আছে, অনুভূতি ও সমবেদনা আছে। জীবনের নিত্যদৃষ্ট, পরিচিত, ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যে যে সহজ রস রহিয়াছে, যাহা এককালে মুখে হাসি ও চোখে জল লইয়া আসে, তাহা কেবল জীবন-রস-রসিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাঁহার অনুভূতি ও সমবেদনায় নূতন করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর ও মর্ম্মস্পর্শী হয়। প্রথম রচনার অসম্পূর্ণতা থাকিলেও এই রস-দৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত ও নিদর্শন রহিয়াছে, তাহাই এই রচনাগুলিকে পাঠক-সমাজে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য আমাকে সাহসী করিয়াছে। কামনা করি, লেখকের এই সহজাত রস-পিপাসার মূলে যে-শক্তি ও শক্তির আভাস রহিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে শাখা-পল্লবে ও ফল-ফুলে আপন বিস্তার ও পরিণতি লাভ করুক।

১লা বৈশাখ, ১৩৪০

রমনা, ঢাকা

শ্রীসুশীলকুমার দে

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

সাহিত্যের হাটে কতশত লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বিশ্ববিশ্রুত মহাজন আপনাদের সর্ব্বজনবাঞ্ছিত পণ্যের বিপণি সাজাইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। পরমশ্রদ্ধাভাজন যে সকল সাহিত্যাচার্য্য অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, উহার উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়াছেন, এবং অবশেষে এই অকিঞ্চিৎকর পসরা সাহিত্য-হাটে প্রবেশযোগ্য বলিয়া ছাড়-পত্র দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়, "পাণিনির পরাজয়" ও "জহরের দুঃখ" শীর্ষক গল্প দুইটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থকারের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। এই গল্প দুইটি "বঙ্গশ্রী" হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

শ্রীলালমোহন দে

সূচী

—চিত্রসূচী—

পুত্রধন

১লা মাঘ, অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির পর দিবস, সকাল বেলা, গৃহিণী যখন এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে গোটা দুই আস্কে ও এক খণ্ড পাটালি গুড় দিয়া বলিলেন,—"নাও, আজ এই দিয়েই চা-টা খেয়ে ফেল। রোজ রোজ ডিম আর পাঁউরুটী ভালোও লাগে!" —তখন, সত্যকথা বলিতে কি, প্রস্তাবটা আমার নিকট আদবেই মুখরোচক বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু যে সুরে গৃহকর্ত্রী তাঁহার ফতোয়া জারি করিয়া গেলেন, তাহাতে যে উহার উপর আর কোনই আপিল চলিবে না ইহা আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম।

সুতরাং, আমিষ ভক্ষণে অভ্যস্ত গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু বিশেষটি মুখ চোখের যে প্রকার ভঙ্গী করিয়া, নিতান্ত পেটের জ্বালায়, ডালভাতের ডেলাটি গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, আমিও অজ্ঞাতসারে কতকটা তাহারই অনুকরণ করিয়া, যুগে যুগে স্ত্রীলোকের মহাকাম্য বস্তু, সাক্ষাৎ স্বর্গের অমৃত স্বরূপ, এক একখানা আস্‌কে তুলিয়া লইয়া উহাদের সদ্গতি করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। গৃহিণীর অবিচারে মনটা এত অধিক তিক্ত হইয়া গিয়াছিল যে ঐ আস্‌কের মুখে পেয়ালার চা-টুকু পর্য্যন্ত যেন বিষবৎ কটু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সিনেমা গৃহে বায়োস্কোপ দেখান আরম্ভ হইবামাত্র প্রথম চিত্রগুলিই যদি পর্দ্দার ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে পতিত না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হয় তাহা হইলে চারিআনা শ্রেণীর দর্শকেরা যে প্রকার যুগপৎ 'সেণ্টার' 'সেণ্টার' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, সকাল বেলাকার জলযোগরূপ এমন উপভোগ্য ব্যাপারটা, শুদ্ধমাত্র গৃহকর্ত্রীর খামখেয়ালীর দরুণ একটা মস্ত ট্রাজেডীতে পরিণত হইল দেখিয়া আমার মনটাও সেই প্রকার ক্ষোভে দুঃখে একেবারে 'মাটিঞ্চকার' 'মাটিঞ্চকার' ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

—কি অদ্ভুত দেশাচার! চালের গুঁড়ার পিণ্ড,—মানুষ অপেক্ষা গয়ার অশরীরী মহাপ্রভুদেরই উহার উপর লোভ এবং দাবী অধিক

হইবার কথা ! কিন্তু দেখ সব দেশের গৃহিণীদের ব্যবহার ! আরে ছোঃ !!

"পুত্রধন" !—

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখি,—আমাদের বাড়ীর বুড়ো গদাই লস্করী চালে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আস্‌কে ভোজন করিয়া মেজাজটা বিগড়াইয়াই ছিল ; তাহার উপর বুড়োর ঐ অদ্ভুত সম্বোধনটা যেন আজ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত বোধ হইল। এক ধমক লাগাইয়া বলিলাম—"ফের 'পুত্রধন' ? ফের ও কথা ? তোমাকে না রোজ রোজই নিষেধ করি যে 'পুত্রধন' বলে আমায় ডাকতে পাবে না ? কথাটা বুঝি গ্রাহ্যই কর না, কেমন ? কাণ দুটি যেদিন ছিঁড়ে দেব চচ্চড়িয়ে, সেইদিন তোমার চৈতন্য হবে দেখচি।"

এইরূপ প্রকাণ্ড একটা ধমক খাইবার জন্য বুড়ো মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কেনই বা থাকিবে ? 'পুত্রধন' সম্বোধনে আমাকে কৃতার্থ সে দিনের মধ্যে, অধিক না হউক, কম পক্ষেও পঞ্চাশবার করিয়া থাকে। কখনও আমার উহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে এরূপ অভিজ্ঞতা তাহার নাই। তাহার উপর 'রোজ রোজই নিষেধ' করিবার কথাটা সম্পূর্ণ অলীক। আমার মনে পড়ে না কখনও তাহাকে বলিয়া দিয়াছি 'পুত্রধন' সম্বোধনে আমার এতটুকু আপত্তি আছে ! অধিকন্তু, যখন এবং যতবার সে

আমাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছে, তখন এবং ততবারই আমি এমন ভাবটাই স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিয়াছি, যাহাতে সে ঐরূপ করিতে সমধিক প্রশ্রয় পাইয়া গিয়াছে। আজ আবার এ কি কাণ্ড! এ যে একেবারেই বিনামেঘে বজ্রপাত!

বুড়ো রীতিমত ভড়কাইয়া গেল। বেচারা! সে ত আর জানে না প্রভাতে অন্দরমহলদত্ত আস্‌কেদ্বয় এই শান্ত স্বভাব লোকটির মস্তকে কি বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

দেখিলাম, বুড়ো শুষ্কমুখে কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া গেল। অধিক নিকটে আসিলে মস্তক হইতে ভগবদ্দত্ত মূল্যবান কর্ণ দুইটি পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, আমার তিরস্কারে এরূপ স্পষ্ট আভাস থাকাতেই বোধ করি সে 'শত হস্তেন বাজীনঃ' নীতি অনুসরণ করিল।

কিন্তু বুড়োর ঐ হতবুদ্ধি ভাব দেখিয়া আমার অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। প্রাতঃকালে, চা পানের সময়টাতে, বুড়ো আমার নিয়মিত সঙ্গী। মাসের ত্রিশটি দিন, ঠিক যখন আমি চায়ের পেয়ালায় সশব্দে চুমুক দিতেছি, 'পুত্রধন' সম্বোধনে আমাকে পরম আপ্যায়িত করিয়া তখনই বুড়ো আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। আমিও দয়াপরবশ হইয়া এ পর্য্যন্ত প্রত্যহই তাহাকে আমার প্রসাদী চা কয়েক চামচ করিয়া বিতরণ করিয়া আসিতেছি। সেই নিয়মের বশীভূত হইয়া আজও সে চায়ের লোভে আমার

নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু চায়ের পরিবর্ত্তে আজ লাভ হইল অপমান ও তিরস্কার।

মনে একটু অনুশোচনা বোধ করিতেই বুড়োকে ডাকিয়া, নিকটে বসাইয়া, খানিকটা চা দিব দিব মনে করিতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম,—বুড়োটি কেউটে সাপের বাচ্চা! কেননা, যখন সে বুঝিল আমা হইতে তাহার দূরত্বটা বেশ নিরাপদজনক, তখন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু উল্‌টাইয়া, সে বলিল—"তুই যে আমাকে বড় বক্‌চিস্? কেন বকচিস্ আমাকে? তোর সেজ বৌ-ইত আমাকে শিখিয়ে দিয়েচে তোকে 'পুত্রধন' বলে ডাকতে। চা দেবে না, কিছু দেবে না, আবার বকুনি! দূর! দূর হ" !!

ক্ষণপূর্ব্বে যে মাত্রায় মনটা নরম হইয়া উঠিয়াছিল, বুড়োর মেজাজ দেখিয়া এখন উহা দ্বিগুণ কঠিন হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলাম—"তোর সেজ-বৌয়ের মাথাটা যেদিন পচা হাঁসের ডিমের মত ক্যাঁক্ করে ভাঙ্গবো, সেদিন আমার মনটা ঠাণ্ডা হবে। ভালো কথা, ভালো সহবৎ তরিবৎ মানুষকে কোথায় শেখাবে, না যত বাজে বকামো আর জ্যাঠামো।— আবার দাঁত বের করে ভেংচী কাটা হচ্চে? তবে রে ব্যাটা, নচ্ছার বুড়ো—ধরতো ওকে, ধর্"—বলিয়া যেন চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছি, এরূপ একটা প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিবা মাত্র বুড়ো "সেজ বৌ, আমায় মারলে,

পুত্রধন আমায় মেরে ফেল্লে” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কক্ষ হইতে কুক্কুরভীত শশকের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল।

কি করিব গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সাধ করিয়া বিপদ ত ডাকিয়া আনিয়াছি। এখনই হয়ত অন্দরমহলটি, দুর্দ্ধর্ষ গুর্খা সৈন্যের ন্যায়, বহির্মহলে ভীমবেগে ছুটিয়া আসিবে। বুড়ো যে সেজ বৌয়ের কি প্রকার প্রিয়পাত্র তাহা আমার অবিদিত ছিল না। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে, তাহার নিকট সর্ব্ব-বিষয়ে অতি মাত্রায় আস্কারা পাইয়াই যে সে গৃহস্বামী আমাকে বড় গ্রাহ্য করিত না ইহাও আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। সর্ব্বোপরি, কেমন করিয়া সে টের পাইয়া গিয়াছিল যে এ বাড়ীতে আমার স্থান, যাহা হওয়া উচিত, সেই সকলের উপরে গৃহস্বামীর স্থান ত নহেই, এমন কি তাহার মত কুপোষ্যেরও বহু নিম্নে। এই টন্‌টনে জ্ঞানটির সদ্ব্যবহার সে যখন তখন এমন সুচারুরূপে করিত যে, সময় সময় অপমানের জ্বালায় আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত রি রি করিয়া উঠিত। অথচ লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতে হইলেও আমাকে ইহা কবুল করিতেই হইবে যে সাংসারিক সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার দায়ে আমি ইহার কোনই প্রতিবিধান করিতে পারিতাম না। ইঁহাতে যদি কেহ কেহ আমাকে নিতান্ত স্ত্রীগতপ্রাণ বলিয়া মনে করিয়া বসেন, তবে আমি নাচার! হায়, তাঁহারা জানেন না, আয়র্‌ল্যাণ্ডের

ম্যাক্‌স্‌ইনী, গুর্জ্জরের গান্ধী মহারাজ এবং বাঙ্গালা দেশের যতীন দাস ছাড়াও আরো কত শত কচ্ছহীন মনুষ্য তাঁহাদের অপেক্ষা বহু অধিক দিনের জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া, যেন বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করিবার জন্যই, অবলীলাক্রমে জীবিত থাকিতে পারেন।

যাহা হউক, যাহা বলিবার নয় অসাবধানতাবশতঃ তাহাই বলিয়া ফেলিলাম। ইচ্ছা করিলে যে এটুকু আর না বলিয়া পারিতাম না, তাহা নহে। কিন্তু কতকটা স্বেচ্ছায়ই ঘরের হাঁড়ি হাটে ভাঙ্গিলাম। আশা, কোনো সদাশয় ব্যক্তি বুড়োর ঐ পেট্রনেস্‌টির হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করিবার বদভ্যাসের কথা যদি সি. আই. ডি. বিভাগের কর্ত্তাদের কাণে পৌঁছাইয়া দেন, এবং তাঁহারাও যদি বুড়োর সহিত উক্ত পেট্রনেসটিকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য শ্রীঘর দর্শন করাইয়া অবশেষে, ভবিষ্যতে আমার সহিত সদ্ভাবে থাকিবার মুচলেকা লইয়া, অব্যাহতি দেন, তবে আমার দগ্ধ অস্থি জুড়ায় এবং আস্‌কে খাওয়াইবার প্রায়শ্চিত্তটাও সদ্য সদ্য হইয়া যায়। কিন্তু যে আমার দুরদৃষ্ট! আশা যে পূর্ণ হইবে সে আশাও করিতে পারি না। তবে মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক আর না-ই হউক, ঐ চিন্তাটাও যেন শীতকালে রৌদ্রে বসিয়া তেল, নুন ও পাকা লঙ্কা সহযোগে পান্তভাত সেবন করিবার মতই অশেষ আরামপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অন্দরের আলো

মনের আনন্দে বিপদ বিস্মৃত হইয়া বেশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়াছি, এমন সময়,—

"পুত্রধন" !—

চাহিয়া দেখি নির্লজ্জ বুড়ো আবার ত বেহায়ার মত ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে! আরো দেখিতে পাইলাম, এবার তাহার হস্তে ছোট্ট একটি চায়ের পেয়ালাও রহিয়াছে।

অন্দরের দিক হইতে যে Amazon অভিযানের আশঙ্কায় এতক্ষণ অস্বস্তিতে কাটাইয়াছি, বুড়োকে পেয়ালা হস্তে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আপাততঃ সে অভিযান মুলতুবী রহিল। সুতরাং তাহাকে আর অধিক না ঘাঁটাইয়া অবিলম্বে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল।

কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া বলিলাম—"কি রে বুড়ো, কি" ?—যেন আমাদের দু'জনার মধ্যে কোনই অসদ্ভাব হয় নাই, এমনই ভাবটা! "কি চাও বাবা" ?

চায়ের ছোট পেয়ালাটা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে বলিল—"একটু চা দে না। বেশী চাইনে আমি, খুব এট্টু। আর কক্ষনো ভেংচী কাটবো না"!

বুড়োর চায়ের নেশা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইল। কিন্তু

সে জন্য আমিই ত প্রধানতঃ দায়ী। দিনের পর দিন, প্রতি প্রভাতে, আমিই তাহাকে চা সরবরাহ করিয়া আসিয়াছি। ফলস্বরূপ আজ সে আমারই ন্যায় একজন পাকা চা-খোর হইয়া উঠিয়াছে। একবেলার জন্যও তাহার ঐ চা-টুকু না হইলে আর চলে না। বুঝিতে পারিলাম, এই নেশার দায়েই সে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে।

বলিলাম, "নিয়ে আয় তোর বাটি, একটু চা দি তোকে"।

বুড়ো বড় চোকস। একটু সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল—"মারিস যদি" ?

"না, মারবো না, আয়"।

বুড়ো আমার নিকটে আসিয়া দাড়াইল। তখনও আমার পেয়ালায় খানিকটা চা পড়িয়াছিল। আমি সেটুকু তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া মাত্র সে চক্‌চক্ করিয়া সেটুকু নিঃশেষ করিয়া কৃতজ্ঞনয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"পুত্রধন, তুই খুব ভালো"।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বুড়ো ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। চক্ষের পলকে দুই হাতে আপনার কাণ দুইটি আচ্ছাদিত করিয়া নিতান্ত মিনতিপূর্ণ নয়নে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। এবার সে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া, একপ্রকার আমার মুখের উপরই, অভ্যাসবশতঃ আমাকে

'পুত্রধন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে। কি জানি যদি আমি পুনরায় ক্রোধান্বিত হইয়া হঠাৎ তাহার শ্রবণযন্ত্র দুইটি সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া বসি, তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কিন্তু আমার আর বুড়োর সহিত খোঁচাখুঁচি করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং যেন 'পুত্রধন' কথাটা আমি শুনিতেই পাই নাই এইরূপ ভাণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম—

"কেন, ভালো কেন আমি"?

"তুই যে আমাকে চা দিস, সেই জন্যেই তুই খুব ভালো"।

"সেজ বৌও ত চা দেয় তোকে; সেজ বৌ বুঝি ভালো নয়"?

আমার অজ্ঞতা দেখিয়া বুড়ো মুখ বিকৃত করিয়া একটু হাসিল। অবশেষে আমার শূন্য পেয়ালার তলদেশে আরোও এক আধ চামচ চা পড়িয়া আছে কি না তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ধুৎ, সেজ বৌ বুঝি আমাকে চা দেয়? এক-দিনও না; একটুও না। বলে কি, 'চা যদি মুখে দিবি ত গলা টিপে তোর চা খাওয়া বার করে দেব'। না বাবু, সেজবৌ আমাকে চা দেয় না"।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন রে? দেয় না কেন"?

"পিসীমা যে বারণ করে দিয়েচে। বলেচে 'চা-পান না বিষ পান'। সেই জন্যে দেয় না চা আমাকে সেজবৌ। তোকে দেয় কেন? তুই বুঝি বিষ খাস"?

অধিকতর আশ্চর্য্য হইতে হইল। কে এই বুড়োর পিসীমা যিনি বিষের সঙ্গে মর্ত্ত্যের অমৃত স্বরূপ চায়ের তুলনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন? কে তিনি যিনি চা বিষবৎ জ্ঞান করিয়া বুড়োকে উহা দিতে নিষেধ করিয়াছেন? আমার যতদূর জানা আছে বুড়োর কস্মিনকালেও কোনো পিসী-মাসীর বালাই নাই। অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—

"তোর আবার পিসীমা কেরে?"

"নেই বুঝি? কলকাতায় থাকে যে।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মাথাটা ঘোলাইয়া গেল। সুবিধা মত বুড়োর এই অজ্ঞাতকুলশীলা, কলিকাতাবাসিনী পিসীমা-টির পরিচয় বাটীর ভিতর হইতে জানিয়া লইব মনে মনে এরূপ নোট করিতেছি, সহসা চাহিয়া দেখি,—গৃহকর্ত্রী সাক্ষাৎ চামুণ্ডারূপে দক্ষিণ হস্তে একটি নাতি বৃহৎ তালবৃন্ত আস্ফালন করিতে করিতে, ক্রুদ্ধা মাতঙ্গিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছেন।

দৃশ্যটি নয়নগোচর হইবামাত্র বুড়ো চক্ষের নিমেষে টেবিলের তলায় অন্তর্দ্ধান করিল। মিথ্যা বলিব না, আমারও বুকের ভিতরটা কেন জানি দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঝাঁ করিয়া

বৈষ্ণব কবিদের কয়েকটি লাইন মনে মনে আওড়াইয়া ফেলিলাম—

দিন গেল মিছে রে ভাই,
রাত্রি গেল মিছে ;
পলাইতে পথ নাই,
যম আছে পিছে।

প্রভাতে প্রাতরাশের নমুনা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম দিনটা "মিছে"ই যাইবে। রাত্রিটাও মিছা যাইবে কিনা তাহা তখন জানিতাম না। কিন্তু ও হরি, তৎপূর্ব্বেই যে যম সম্মুখে ছুটিয়া আসিতেছেন ! "পলাইতে পথ নাই"ত বটেই ; যেহেতু যে পথে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব ঠিক সেই পথেই যমরূপিনী গৃহকর্ত্রী হুড়মুড় করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত !

ভীষণ একটা সংঘর্ষ আশঙ্কা করিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু প্রবল এক ঝাঁকুনি খাইয়া হাত পা ছাড়িয়া পুনরায় বসিয়া পড়িতে হইল। চকিত দৃষ্টিতে দেবীর হস্তস্থিত তালবৃন্তটির ভীতিজনক আন্দোলন দর্শন করিতেছি, এমন সময় আকাশের শতবজ্র যেন গৃহমধ্যে বিদীর্ণ হইল—

"বদমায়েস, পাজী, বুড়োটা গেলো কোন্ দিকে বল ত ? আজ এ পাখা লক্ষীছাড়ার পিঠে ভেঙ্গে তবে ছাড়ব। শীগগির বল কোন্ দিকে গেলো ড্যাকরা।"

পুত্রধন

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলাম। ঘাম দিয়া জ্বর ত্যাগ হওয়া আর কাহাকে বলে? বুঝিলাম, লক্ষ্য আমি নই বাবা। "টার্গেট" ঐ ব্যাটাচ্ছেলে চা-খোর বুড়ো। কিন্তু কাণ্ডখানা কি? যে বুড়ো গৃহকর্ত্রীর নয়নের মণিস্বরূপ, তাহারই উপর আজ অকস্মাৎ সরকারের এই জুলুম কেন হইল? কিন্তু চিন্তা করিবার অবকাশ কোথায়? দেখিতে দেখিতে পদাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় এলায়িতকেশা ধূমাবতী ঘোর রবে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"বলি, কাণের মাথা কি একেবারেই খেয়েচ? কি জিজ্ঞেস করচি শুনতে পাওনা? বুড়ো গেলো কোন্ চুলোয়? লঙ্কা পোড়ানে, হতচ্ছাড়া, সর্ব্বনেশে! আজ ওরই এক দিন, কি আমারই একদিন।"

পণ্ডিতেরা অপ্রিয় সত্য বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম, উক্ত মহাজনবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে বুড়োর দফা একদম রফা। কুপিতা দেবী যেদিকে দাঁড়াইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সেদিকে টেবিলক্লথটি প্রায় ভূমি সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতেছিল। বুঝিতে পারিলাম, ঐদিক হইতে বুড়োকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবার তত আশঙ্কা নাই। কিন্তু আমার দিক হইতে বুড়োকে স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম,—টেবিলের তলায়, মুক্ত পদ্মাসনে বুড়ো

নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পাছে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে তাহার উপস্থিতি ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে রেচক পূরক ক্রিয়া বন্ধ করিয়া, কুম্ভকযোগে সমাবিষ্ট মহাযোগীর ন্যায় সে অবস্থান করিতেছে আমার নিকট এইরূপ বোধ হইল। কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, মুখে চোখে খানিকটা সপ্রতিভ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া, বলিলাম—

"বুড়ো গেলো কোন্ চুলোয় সে কি আর আমি জানি? আমার কাছ থেকে ত আর সে অনুমতি নিয়ে যায় নি। যে বাধ্য ছেলে তোমার।—তা' অত রাগই বা করচ কেন? কি করেচে সে?"

আবার মেসিনগান ছুটিতে আরম্ভ করিল।

"করেচে তোমার মাথা। খালি খাবার বেলা, কেমন? বাবা গো বাবা! এমন নিষ্কর্ম্মা আয়েসী মানুষ তোমার মত আমি ত্রিভুবনে কোথাও দেখিনি। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই—সকাল বেলা ছেলেটার দিকেও ত একটু নজর রাখতে পার। একা একা আমি আর কত দিক সামলাই?—ডালটা সাঁতলে রেখে গেছি আমি ওপর থেকে মাছের পয়সা আনতে,—এসে দেখি কি, ওগো মাগো—ডালের ভেতর এক ঘটি জল থৈ থৈ করচে, আর যত ন্যাজ্যের ছেঁড়া, নোংরা কাগজ আর কোব্রা পালিশের টিন তার ওপর ভাসচে। দিলে এক রাশ ডাল নষ্ট করে! আর শুধু কি

ডাল? একপো' ডালে ঘি ঢেলেছিলুম কম করেও এক ছটাক। গেলো, গেলো, সব গেলো। শত্তুরটাকে একবার পাই ত—”

বলিয়া বুড়োর গর্ভধারিণী আমার অতি সাদাসিধে রকমের মুখখানার নিকটে আপনার চন্দ্রবদনখানি আনিয়া এমন সশব্দে দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিলেন যে, ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া, চেয়ার ঠেলিয়া আমাকে একটু সরিয়া বসিতে হইল। বলা ত যায়না, কি জানি যদি ক্রোধের বশীভূত হইয়া, অনুপস্থিত শত্তুরটির অভাবে, এই সশরীরে উপস্থিত শত্তুরের মস্তকেই খ্যাঁক করিয়া এক কামড় বসাইয়া দেন তবে হয়ত পাস্তুর চিকিৎসার জন্য আমাকে এই দণ্ডেই কলিকাতায় ছুটিতে হইবে!

তথাপি, পুরুষ বাচ্চা ত বটে! এই স্বরাজ পাইবার দিনে স্বরাজ্যে বসিয়া এত ভয় পাইলেই বা চলিবে কেন? একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—“সেজবৌ, তুমি আমার ওপর অত খাপ্পা হচ্চ কেন বল দিকি? আমি ত আর তোমার ডাল নষ্ট করিনি। যে নষ্ট করেচে তাকে তুমি যত খুসী বকো গে, যাও।”

ভীষণ একটা অঙ্গভঙ্গি করিয়া তৃতীয়া বধূ বলিলেন,—“একশো বার খাপ্পা হব তোমার ওপর। আমি বুঝি কিছু আর শুনিনি মনে করেচ, কেমন? বুড়োর কাছে খুব বীরত্ব দেখান হচ্চিল—

'সেজবৌয়ের মাথাটা পচা হাঁসের ডিমের মত ক্যাক্ করে ভাঙ্গবে, তবে ছাড়বে।' এই তোমার কথা, অ্যাঁ, এই তোমার কথা নাকি?

ভাঙ্গ না,—ভাঙ্গ.

ভাঙ্গনা সেজবৌয়ের মাথাটা,—ভাঙ্গ—ভাঙ্গ"—বলিয়া, ক্রোধোন্মত্ত ষণ্ডটী যে প্রকার শিং বাগাইয়া, মাথা হেঁট করিয়া শত্রুকে ঢু

মারিতে ছুটিয়া আইসে, সেই প্রকার গ্রীবা বাঁকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে গৃহকর্ত্রী আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন।

দূর ছাই! বার বার এই প্রকার আরম্ভ হইলে কি আর বসিয়া থাকা যায়? চেয়ার ছাড়িয়া সলম্ফে উঠিয়া পড়িলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় স্ত্রীলোকেরা শৃঙ্গহীনা। নচেৎ আজ হয়ত আমাকে শিঙের গুঁতা খাইয়া, চেয়ার হইতে ছিটকাইয়া দশ হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে হইত।

সে যাহা হউক। পণ্ডিতেরা ত অপ্রিয় সত্য বলিতে দুই হাত ঘন ঘন সঞ্চালিত করিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অপ্রিয় সত্য কথন নিষিদ্ধ হইলে সদ্য সদ্য হিতকর মিথ্যাভাষণ নিশ্চয়ই তাঁহাদের অনুমোদিত। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—

"আরে রামশ্চন্দ্রঃ! কি বল্লুম, আর কি শুনলেন! কাণে বোধ হয় আজকাল একটু বেশী শুনে থাক? বুড়ো এসে তখন বল্লে—'পুত্রধন, একটু ডিম খাবো।' আমি বল্লুম—'আমি খেলাম আস্কে আর গুড়; তোকে ডিম দেব কোথা থেকে? সেজবৌয়ের কাছ থেকে নিগে যা'। ও বল্লে, 'বৌয়ের কাছে ডিম আর নেই। ঝুড়িতে ক'টা কালো মত পড়ে রয়েচে; সেগুলো সব পচা।' শুনে আমার ভারি দুঃখ হ'লো। একটি মাত্র ছেলে; একটু ডিম খেতে চাইলে, তাও দিতে পারলুম না। এমনি অদৃষ্ট!

গিন্নি কি শুধু পচা ডিমেরই কারবার করেন। মনে একটা ক্ষোভ হওয়ায়, বুড়োকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তখন বল্লুম, 'আচ্ছা, একটু সবুর কর বাবা। সেজবৌয়ের ঘরে যত ডিম আছে সব ক্যাঁক্ করে ভেঙ্গে ছাড়ব।' এইত মাত্র বলেছি। আর তুমি শুনলে কি? তোমার মাথা ভাঙ্গব পচা হাসের ডিমের মত ক্যাঁক্ করে? তাও আবার আমি? এতই ক্ষমতা হয়েচে আমার? হা মধুস্থদন! কোথা রাম, আর কোথা গঙ্গা।" বলিয়া, অতি সন্তর্পণে আমি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু বিপদ নাকি আবার কখনও একলা আসিয়া থাকে? এ যে সমুদ্র-স্নান বিশেষ। প্রথম ঢেউয়ের চোট সামলাইতে না সামলাইতে মাথার উপর দ্বিতীয় ঢেউ আসিয়া উপস্থিত। সহসা আমার শূন্য পেয়ালার পার্শ্বে বুড়োর ক্ষুদ্র পেয়ালাটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই গৃহকর্ত্রী পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"এই মরেচে যা! আবার ছেলেকে চা খাওয়ান হচ্ছিল বুঝি? নিজে কপ্ কপ্ করে ঐ বিষগুলো গেলো, এই যথেষ্ট। আবার বুড়োকে এসব শেখানো কেন? আহ্লাদ দেখে কোথা যাবো গো, ওগো মাগো! পাঁচ বছরের ছেলের মুখে তুমি বাপ হয়ে কি বলে ঐ বিষগুলো তুলে দাও, বল দিকি? সার পি. সি. রায় যে বলেছেন, 'চা পান না বিষ পান' সেটা বোধ হয় তোমার গোবরপোরা মাথায় এখনও ঢোকেনি, কেমন? ফের যদি তুমি

বুড়োকে চা দেবে, তবে বাড়ী থেকে আমি চায়ের পাট তুলে দেব—একেবারে। ওঁর জন্যে সকাল সন্ধ্যে পঞ্চাশ বার চা ফুটিয়ে ফুটিয়ে হাড়ে আমার কালি পড়ে গেল। আবার ছেলেকে নিজের মত একের নম্বর চা-খোর করে তোলো, আর বুড়োর বৌ এসে আমার মত হাড়েনাড়ে জ্বলেপুড়ে খাক্ হোক। বুদ্ধি আক্কেল তোমার কবে হচ্চে বল ত ? গয়লা ত আর নও যে আশী বচ্ছরের আগে—”

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—“থাক, থাক, আহা থাক না সে সব কথা। তুমি যা বলবে আমার জানাই আছে। তোমার পছন্দ না হয়, এই চোখ ছুঁয়ে বলছি, বুড়োকে আর চা দেব না। আমি ত আর বেশী কিছু ওকে দিতে যাই নে। মোটেই চার পাঁচ চামচ।”

এক সঙ্গে গণ্ডা দশেক চন্দ্রবিন্দু মানুষ উচ্চারণ করিতে পারে না। দেখিলাম, মানুষী পারে। যে এস্রাজে সুর বাঁধা হয় নাই, তার গুলো যার ঢিলাঢালা হইয়া আছে,—এমন যন্ত্রে ছড়ি টানিলে যে প্রকার একটা কর্কশ ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ শব্দ উত্থিত হয়, গৃহকর্ত্রী ঠিক সেই প্রকারের একটা ঝঙ্কার তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—

“মোঁটেঁইঁ চাঁর পাঁচঁ চাঁমচঁ। তাই বাঁ দিতেঁ যাঁবেঁ কেঁন ?” তাহার পর, চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়া,—“বিষের এক ফোঁটাও যা, চার পাঁচ চামচও তাই। পি সি রায়ের লেখাটা একবার পড়ে দেখো,

বুঝলে? আজই পড়বে, আর রাত্রিবেলা আমাকে বলবে কি বুঝেচ।”

হায় সার পি. সি. রায়! হায় বুড়োর কলিকাতাবাসিনী পিসীমা!! রসায়ন শাস্ত্রের তাবৎ গলি ঘুঁজি ছাঁকিয়া ফেলিয়া, নূতন বিষয়ের অভাবে এখন কি চায়ের পশ্চাতে লাগিয়াছ? নূতন বিষয়েরই বা অভাব কি প্রকারে হইল বুঝিতে পারি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গবেষণা করিবার মত কি আর কিছুই নাই? ইংরেজী শাস্ত্রের যাবতীয় বিষ লইয়া ত যথেষ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছ। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তূক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রীক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হলাহল, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বিষও যে তোমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিয়াছে তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু জনৈকা স্ত্রীলোকের রসনাগ্রে যে ভয়ঙ্কর আশীবিষ নীড় রচনা করিয়া আমার জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে উহা লইয়া কি কখনও মাথা ঘামাইয়াছ? না ঘামাইয়া থাকিলে, আমার একান্ত অনুরোধ, ঐ বুনসেন বার্ণার টার্ণারের সাহায্যে গবেষণা করিয়া বাহির করিয়া দাও কি টিংচার, ট্যাবলেট, ভ্যাকসিন বা বোরিক-কটন সেবন করাইলে তোমার ঐ পরম ভক্তটির মুখস্থিত বিষভাণ্ড সুধাভাণ্ডে পরিণত হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া গৃহিণী আর

অধিক বাড়াবাড়ি করিলেন না। তাড়াতাড়ি অঞ্চল হইতে একটি আধুলি খুলিয়া, আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া, বলিলেন, "নাও, দৌড়ে বাজার থেকে মাছটা এনে দাও দেখি। ডালটা যখন নষ্ট হয়েচে, ত হয়েচেই। কি আর করা যাবে? আজ আর ডাল রাঁধতে পারব না; সাফ্ মাছের ঝাল, আর ঝোল, আর ভাত। রমেশ উকিলের বউ কাল অনেক করে হাতে ধরে বলে গিয়েচে; রাত্তিরের খাওয়া আমি আর বুড়ো ওখানেই খাবো। নইলে ভালোও দেখায় না। ওবেলায় আর রান্নাবাড়ার হাঙ্গাম নেই। তোমার জন্যে এবেলাকার খানিকটা মাছের ঝোল আর গুটি দশেক কালকেকার আস্কে ঢাকা দেওয়া থাকবে। সময় মত ঢাক্না খুলে তাই তুমি খেয়ে নিও, বুঝলে? ঝোলে আস্কে ভিজিয়ে নরম তুলতুলে করে খেতে কী যে ফ্যান্সি লাগে! ওসব লুচি সন্দেশ নিতান্ত দায়ে পড়ে আজ আমার খেতে যাওয়া। নইলে আমিও ঐ আস্কেই খেতাম ঝোল দিয়ে। চা দিয়ে যে খেলে দুখানা, লাগল কেমন?"

বঙ্কিমবাবুর "কপালকুণ্ডলা" খানা সম্প্রতি শেষ করিয়াছিলাম। প্রথম সমুদ্র দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নবকুমার উহাতে বলিয়াছে,—"আহা, কি দেখিলাম, কি দেখিলাম"! কথাগুলি আমার সুস্পষ্ট মনে ছিল। সুতরাং উত্তর দিতে বিলম্ব

হইল না। একটা বড় রকমের ঢোক গিলিয়া বলিলাম—"আহা, কি খাইলাম, কি খাইলাম গো! চায়ের সঙ্গে আস্‌কে,—অতি সুস্বাদু, অতি উপাদেয়!!"

গৃহকর্ত্রী প্রসন্না হইয়া বলিলেন—"ওমা, তা আর হবে না? আমার হাতের আস্‌কে!! রোজ একগুলি করে তামাক প্রিমিয়াম দিয়ে তবে কালীর পিসীর কাছ থেকে হাতে কলমে আস্‌কে গড়তে শেখা। আমি তেমন মেয়ে নই। আই. এ. পাশও করেচি, আস্‌কেও গড়তে শিখেচি। নিতান্ত প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, তাই তোমার মত থাড্ড-কেলাশ-পর্য্যন্ত-পড়া—দালালের ঘর করচি। নইলে ঐ ধীরেন ডেপুটির সঙ্গে বিয়ের কথা আমার ত এক রকম পাকাপাকিই হয়ে গেছ্‌ল। শুন্তে পেলাম, লোকটা বদ্‌মেজাজী আর পাঁড় মাতাল। শোনা মাত্র নিজ হাতে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। যেখানে আমার কর্ত্তৃত্ব খাটবে না সেখানে আমার বিয়ে মাথায় থাক। বাপরে! তার চেয়ে অজ-মূর্খের হাতে পড়ি তাও শতগুণে ভালো। Milton এর নাম শুনেচ? কোত্থেকে আর শুনবে বল? বিদ্যে ত ঐ থাড্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত!"

চুপ করিয়া থাকা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। আমার যতদূর বিদ্যা গৃহিণী তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি, Milton এর নামটা আমার দালালী ব্যবসায় সম্পর্কে জানাই

ছিল। সুতরাং মনে মনে একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম—"Milton এর নাম আর কে না শুনেচে? কলকাতার ঘোড়াওয়ালা ত? যার মস্ত আস্তাবল—"?

মুখের উপর দশমুণি এক মুগুর আসিয়া পড়িল—"দূর, দূর! আ আমার পোড়া কপাল! মুচী শুধু চামড়ার স্বপ্নই ছাখে! সে Milton নয় বাপু, সে Milton নয়। Milton ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মস্ত কবি। যাঁর বই Paradise Lost আমাদের পাঠ্য ছিল। সেই Milton বলেছেন—'Better reign in hell, than serve in heaven'. অর্থ হলো গিয়ে—'স্বর্গে গোলামী করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করাও ভালো'। ভেবে দেখলাম, ধীরেন ডেপুটির ঘরে গোলামী করার চেয়ে দালালের ঘরে রাজত্ব করাও ভালো। তাই না তুমি আমাকে পেয়েচ।"

আপন মনে বলিলাম,—তোমাকে পাইয়া ত আমি আর আমার ছাপ্পান্নপুরুষ উদ্ধার হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্ত যাঁহারা কোমর আঁটিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহাদের একবার পাই ত—

আই-এ পাশ বলিতে লাগিলেন—'যাক্, আজ এই পর্য্যন্ত। অনেক কথাই বল্লে, এখন ক্ষ্যামা দাও। আমি তা'হলে বেগুন আলুটা কুটে রাখিগে। তুমি ততক্ষণ মাছটা এনে

ফেল। আর, বুড়োকে বাইরে দেখতে পেলে তুমি ওকে কিছু বলো টলো না যেন। হাজার হোক্, ছেলেমানুষ ত বটে। না বুঝে যদি একটা কুকাজ করেই থাকে, তাই বলে দুধের ছেলের ওপর হাত তোলবার তুমি কে" ?

আমি মুহুর্মুহু ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—"সে আবার একবার বলতে! বুড়োর ওপর যদি আমি কোনো অত্যাচার করি তবে এই টেবিলের তলায় আমায় একঘণ্টা বসিয়ে রেখো। শীতকাল হলে কি হয়, ভারি গরম বোধ হচ্ছিল কিনা, তাই পাখাটা—"

"অম্নি আরম্ভ হলো তোমার ইয়ে। বলে,—'নির্গুণো মানুষের তিন গুণো কথা'। থামোঃ"—বলিয়া এক ঝামটায় আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া গজেন্দ্রগামিনী হেলিয়া দুলিয়া রন্ধনশালার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণব কবিদের বাণী জয়মর হউক !!

দিন গেল মিছেরে ভাই,
রাত্রি গেল মিছে ,--

সুন্দর, অতি সুন্দর! দিন ত মিছাই গিয়াছে; রাত্রিটাই যা বাকি ছিল! পাকা আই. এ. পাশ গৃহিনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি কিছুই

এড়ায় না। দয়া করিয়া তিনি রাত্রির ব্যবস্থাটাও করিয়া গেলেন!

গোল্লায় গেছি আর কি! বাপ্ স্!! গুটিদশেক গণ্ডার-চর্ম্মবৎ সুকোমল, পর্য্যুসিত, আসকে আর তদুপরি মৎস্যের সুরুয়া। একাধারে হৃদ্য, বৃষ্য, পরম-রসায়ন, এবং উৎকৃষ্ট বাজীকরণ! হে মা ওলাউঠে, এক্কি চোটে খাঁচার দরজাটি খুলিয়া হুস্ করিয়া শ্রীমান আত্মারামকে উড়াইয়া দিও না যেন! আমার একটু কষ্ট হয় হউক। তথাপি আই. এ. পাশ আসকেওয়ালীকে যেন ঘণ্টায় অন্ততঃ ত্রিশবার, একতলা হইতে দোতলায়, দোতলা হইতে একতলায়, বেডপ্যান হস্তে ছুটাছুটি করিয়া বেজাহান হয়রান হইতে হয়।

আর—

পলাইতে পথ নাই,
যম আছে পিছে।

শুধু পিছে কেন বাবাজী? সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, অন্দর মহলে, বহির্ম্মহলে—সর্ব্বত্র, এবং শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বাবস্থায়ই আমি যম সন্দর্শনের পুণ্যসঞ্চয় করিতেছি।

একেবারে হতভম্ব অবস্থা যাকে বলে!!

"পুত্রধন" !—

ওঃ, বুড়োর কথা ত ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু এত কষ্টের পর ঐ সম্বোধনটা এবার সত্যসত্যই আর সহ্য হইল না। মাথার ভিতর টর্ণাডো, টাইফুন, সাইক্লোন, সিরোক্কো সব একসঙ্গে প্রলয়ের মাতামাতি দাপাদাপি সুরু করিয়াছে। চৌদ্দইঞ্চি-শেল-ফাটা একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলাম— "আবার পুত্রধন? হতভাগা, পাজী, লক্ষীছাড়া, গাধা! এবার কাণ যদি তোর না ছিঁড়েচি ত"—বলিয়া, ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

চক্ষের পলকে টেবিলের তলা হইতে আমার বিপরীত দিক দিয়া তাড়িত মার্জ্জারের ন্যায় ফস্ করিয়া বাহির হইয়া— "ও সেজ বৌ, আমার কাণ ছিঁড়লে, পুত্রধন আমার কাণ একেবারে ছিঁড়ে ফেল্লে গো" বলিয়া, অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বুড়ো বাহিরের দিকে ভোঁ দৌড় মারিল।

নেপথ্য হইতে একটা বামাকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—"দাঁড়া, দাঁড়া, যাচ্ছি।"

আমি কি আর সেখানে দাঁড়াই মশায়! স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম, মনের ভিতর বেতারবার্ত্তা বিঘোষিত হইতেছে—

survival of the quickest! সুতরাং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তাড়াতাড়িতে ডান পায়ের চটি বাম পায়ে এবং বাম পায়ের চটি ডান পায়ে চড়াইয়া, চটর চটর ফটর ফটর শব্দে

মৎস্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিলাম।

দশদিক মুখরিত করিয়া, মৎস্যের সন্ধানে বাজারের দিকে ছুটিয়া চলিলাম।

শীতের একরাত্রি

গভীর রজনীতে, আমাদের বাড়ীর অনতিদূর হইতে, একটা হাহাকার-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেই চট্ করিয়া ঘুমটা ছুটিয়া গেল।

গৃহমধ্যে বাতি ছিল না। পথের বৈদ্যুতিক আলোর আভায় ঘরটি অস্পষ্ট আলোকিত হইয়াছিল। অপর পার্শ্বে দ্বিতীয় শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। শুধু শুভ্র একটি মশারি ব্যতীত অন্য কিছুই সে দিকে নয়নগোচর হইল না। ঐ মশারির অন্তরালে দু'টি প্রাণীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের মৃদুশব্দ তালেতালে উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। বুঝিলাম, পুত্রসহ

শীতের একরাত্রি

গৌরী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। ডাকাডাকি করিয়া আর তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে ইচ্ছা হইল না। বিশেষতঃ, যদি গৃহিণীকে জাগাইতে গিয়া তৎপার্শ্বলগ্ন ক্ষুদ্রশাবকটিরও নিদ্রা-ভঙ্গজনিত অপরাধ করিয়া বসি, তবে ত—বাপ্‌রে, গেছি আর কি। সে অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত,—অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বিনিদ্র অবস্থায় মার্জ্জার কুক্কুর প্রভৃতির কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর রূপে অনুকরণ করিয়া অপোগণ্ডটির চিত্ত-বিনোদন করা। কেননা, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, গৌরীর তন্দ্রা-জড়িত মধুর কণ্ঠ এবং সোহাগপূর্ণ মধুরতর তানলয় নিদ্রা-দায়িকা "মাসী-পিসী" প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় আত্মীয় কুটুম্বকে একলক্ষবার আহ্বান করিলেও উক্ত দুগ্ধপোষ্যটির আর দ্বিতীয়বার নিদ্রাকর্ষণ হইবে না ইহা আমি বিলক্ষণ জানিতাম। অতএব ডাকাডাকির কোনোই প্রয়োজন নাই ইহা মনে করিয়া, ঐ বক্ষভেদী আর্ত্তনাদ পুনরায় উত্থিত হয় কিনা দেখিবার জন্য নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। মুহূর্ত্তপরে শুনিতে পাইলাম, একটি স্ত্রীলোক বক্ষে সবলে করাঘাত করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে পথ চলিতেছে।—"মা, মাগো! ওরে আমার মা, আমার মা রে! —ওরে জয়দেবের মা—ওরে জয়দেবের মা রে, তুই কোথায় গেলি

রে! ওরে, ও জয়দেবের মা—তুই আমার এ কি করে গেলি রে” !!

স্ত্রীলোকটির করুণ আর্ত্তনাদে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ব্যাপার কি? এই স্ত্রীলোকটি কে? জয়দেব কে? জয়দেবের মা-ই বা কে? কি হইয়াছিল তাহার? কখন সে মারা গেল?—এইরূপ অসংখ্য প্রশ্ন মনে উদয় হইতে লাগিল।

নিশীথ রাত্রি। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নাই। নিঃশব্দে পৌষের হিম পড়িতেছিল। ঘোরা যামিনীর নিস্তব্ধ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল—“আমি বুড়ি রইলাম পড়ে, মাগো! যম আমায় চিনলে না রে! পোড়া যম আমায় কেন নিলে না রে, মাগোঃ! ওলো, ও জয়দেবের মা,—ও জয়দেবের মা—জয়দেবের মা লো————” !!

দুর্ব্বহ শোকে অধীর হইয়া বৃদ্ধা বিপুল বেগে বক্ষে করাঘাত করিতেছিল। ভাঙ্—ভাঙ্, বক্ষ শতধা বিদীর্ণ হ,—ইহাই বুঝি অভাগিনীর মনোভাব।

আপন দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলাম,—শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্তরবৎ শীতল ও স্পন্দনহীন। ধমনীতে কি শোণিত প্রবাহ স্তম্ভিত হইল? ভয় পাইয়াছি

শীতের একরাত্রি

ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। জীবনে কত মৃতদেহ দেখিয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি, চিতায় ভস্মীভূত করিয়াছি। কিন্তু কোথায়, মনে ত হয় না, আজিকার ন্যায় এমন একটা ভীত, ত্রস্ত, চকিত ভাব আমার মনের উপর কোনো দিন এতটুকু আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় অপর বিছানায় গৌরী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর আমাকে লক্ষ্য করিয়া এমন কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল যে বুঝিতে পারিলাম প্রশ্নকারিণীর হৃৎপিণ্ডটি তাহার বক্ষমধ্যে অতি দ্রুত আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

"জেগে আছ ? ওগো, জেগে আছ তুমি ?"

"হুঁ"।

"কতক্ষণ" ?

"এই হলো কিছুক্ষণ"।

"ব্যাপার কি গো ? পথে কে এমন করে কাঁদে ? মা গো মা ! এমন করে ঘুমটা ভেঙ্গেচে যে এখনও বুকের ভেতরটা আমার ধড়াস ধড়াস করচে। কে কাঁদে গো" ?

"কি করে বলবো ? তুমিও যেখানে, আমিও সেইখানে"।

"কেউ মরেচে বোধ হয়" ?

"বোধ হয় নয়,—নিশ্চয়"।

"উঠে একবার"——

গৌরী কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। বিলাপ-কারিণীর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ বড়ই স্পষ্টরূপে কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে আমার শয়নকক্ষটি যেন বিলাপ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—"আমি অভাগিনী রইলাম পড়ে —মা গোঃ! এ দুখিনীর ভাগ্যে পোড়া বিধি কত দুঃখ লিখেছিল গো—মাগোঃ! ওরে ও জয়দেবের মা,—এমন চণ্ডালের হাতে তোকে দিয়েছিলেম গো! তোর ঐ চাঁদমুখে একদিনের তরেও আমি একটু সুখের হাসি দেখতে পেলাম না—মা গোঃ" !!

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যার একপ্রান্তে অসাড়ে পড়িয়াছিলাম। কর্ণ দুইটি যেন বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা লইয়া শোকোন্মত্তার প্রত্যেকটি কথা গিলিয়া ফেলিতেছিল।

অকস্মাৎ দেহে একটা তুষার-শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া অতি মাত্রায় চমকিত হইয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, গৌরী মশারি সরাইয়া শয্যাপার্শ্বে মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। বিপরীত দিকের গবাক্ষপথে খানিকটা নিষ্প্রভ আলো মুখে আসিয়া পড়ায় স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম চেহারাটা তা'র অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবস্থাটা একমুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি ত্রস্তে বিছানায় উঠিয়া

বসিলাম। পরক্ষণে তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া আনিয়া বসাইলাম।

"ভয় পেয়েচ বুঝি"?

"খুব"।

"তা অত ভয়েরই বা কারণ কি? মানুষ ত রোজই মরচে"।

"ঠিক। কিন্তু এই গভীর রাতে—এমন বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না ত আর রোজই শোনা যায় না। শুনেচ কখনো? আমি ত কক্ষনো শুনিনি। ভারি খারাপ লাগচে। মনে হচ্চে যেন—ঐ যার নাম ধরে পথে মেয়েটা কাঁদচে, তার মৃত দেহটা আমাদের ঐ পাশের ঘরেই পড়ে রয়েচে, আর তার মা সেখানে বসে এমন বুক-ফাটা কান্না কাঁদচে! গা-টা এমন ছমছম কত্তে লাগল যে একলা ও বিছানাটায় আর থাকতে পারলুম না। বোধ হচ্চিল যেন শরীরটা আমার ক্রমাগতই ভারি হয়ে বিছানার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্চে! যেন শত চেষ্টা করেও আমি আর নড়তে চড়তে পারচি নে। তাই, টুনুটাকে বুকে আঁকড়ে, কোনো গতিকে নিজকে যেন বিছানা থেকে ছিঁড়ে, তোমার কাছে পালিয়ে এসেচি"।

মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম! আমি স্বামী! এই অসহায়া অবলা আমার স্ত্রী! নিতান্ত ভীত হইয়া আমার মশারির

নীচে আশ্রয় লইয়াছে, অভয় মাগিতেছে। আমি কি তাহাকে বিমুখ করিতে পারি? সস্নেহে গৌরীকে আরো অধিক নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিলাম—"পালিয়ে এসেচ, বেশ করেচ। আমাকে যদি একটু ডাকতে, আমি নিজেই দৌড়ে তোমার কাছে যেতাম। যাক্, এখন ত আর ভয় করচে না? ভয় কি ?, আমি ত পাশেই বসেচি। আমার কিন্তু একটুও ভয় করচে না।"

অস্ফুট একটা হাস্যের মৃদুগুঞ্জন কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। তারপর উত্তর শুনিলাম—"নাঃ, তোমার একটুও ভয় করচে না! মস্ত দুঃসাহসী বীরপুরুষ কি না! একটুও আবার তোমার ভয় করচে না। আমি জানি খুব ভয় করচে তোমার। নইলে, একটু হাত দিতেই এম্নি চমকে উঠলেন যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্ লাগল"!

শোনো কথা! আমি পেলাম ভয়! স্ত্রীবুদ্ধি আর কা'কে বলে! ও হরি! ইনিই আবার ভয় পাইয়া আমার বিছানায় আশ্রয় লইয়াছেন। এখন বুঝিতেছি—ও সমস্তই নাটুকে ঢং মাত্র। মনে করিলাম, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই চারিটা খুব কড়াকড়া বুলি শুনাইয়া দিই। কিন্তু রাগ করিলাম না। লাভ কি? কেবল মনে মনে ভাবিলাম,—আমারই ত স্ত্রী। বিবাহ করিয়াও বছর খানেক ইস্কুলে

পড়াইয়াছি। বুদ্ধিশুদ্ধি একটু আধটু হইবে বই কি। সামান্য চমকাইয়াছিলাম, তাহাও তার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে হইল।

"ভয় পেয়েই যে আমি চমকেছিলাম একথা তোমায় কে বল্লে? আর কেনই বা ভয় পেতে যাব বল দিকি? একটা বুড়ীর মেয়ে মরেচে। বুড়ী তাই কাঁদচে। আমার ঘরে আমি আছি, আর আছ তুমি। ভয় পেতে গেলাম কিসের জন্যে?—তবে চমকে যে উঠেছিলাম তার কারণ হচ্চে এই যে,—চোখ বুজে ঐ মেয়েটার বুক-চেরা কান্না শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, যার জন্যে অত হাহাকার,—একটু আগেই যে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছিল—সে এখন গেল কোথায়? তারপর ভাবলাম, লোকে বলে, মানুষের মৃত্যু হলে তার আত্মা দেহপিঞ্জর হতে মুক্তিলাভ করে।—আচ্ছা, ঐ জয়দেবের মায়ের আত্মা মুক্তি লাভ করে যদি ঐ ডান দিককার খোলা জানালা দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকে, আর, একবার তোমার মশারির ভেতর, একবার আমার মশারির ভেতর উঁকি মেরে বেড়ায়, তবে অবস্থাটা দাঁড়ায় কেমন? যখন এই সব কিম্ভূতকিমাকার চিন্তা আমার মাথার ভেতর দাপাদাপি করছিল, ঠিক সেই সময় তুমি আমার গা ছুঁলে। আর হাত খানাও তোমার ছিল—এমন

ঠাণ্ডা! যেন এক টুকরো বরফ! এখন ভেবে দেখ, যে অবস্থায় পড়লে তুমি হয়তো দাত কপাটি লেগে অজ্ঞান হয়েই যেতে, সেই অবস্থায় যদি আমি একটু চম্‌কেই থাকি, তাতে কি আমার খুব ভয় পাওয়া প্রমাণ হলো" ?

"প্রমাণ যা-ই হোক না কেন, দোহাই তোমার, ঐ মশারির ভেতর উকি মারার কথা টথা আর এই দুপুর রাতে, আঁধার ঘরে, ব'লো না। দুর্গা! দুর্গা!! দেখ, আমার গা কাঁটা দিচ্চে। আমি বাপু আজ আর ও বিছানায় গিয়ে শু'তে পারব না, বলে দিচ্চি। তোমার এই বিছানায়ই শোবো,—আমিও, টুনুও, তুমিও।—টুনুটা থাকল এই খানটায়। আমি ঐ পায়ের দিকটায় গুটিশুটি মেরে কোনো প্রকারে রাত পার করে দেবো। শীতের রাত—কোনোই কষ্ট হবে না। ডান দিককার ঐ জানালাটা যদি বন্ধ করে দিয়ে এসো।—কাল সকালে তোমার খাট আর আমার খাট—দু'খানা এক সঙ্গে জোড়া করে দিও। আর মিস্ত্রী ডাকিয়ে হয় একটা বেড্-সুইচ্ লাগিয়ে নেবে, নয়ত শোবার সময় জ্বালাবার জন্যে একটা হারিকেন কিনে আনবে, বুঝলে? আঁধার ঘরে আমার ঘুম হয় না"।

ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইল। কী ভীতু স্ত্রীলোকের পাল্লায়ই পড়া গেছে! বলিলাম—"এতদিন ঘুমের তোমার কোনোই ব্যাঘাত হলো না, আর আজ জয়দেবের মা কেষ্ট পেতে

না পেতে তোমার আঁধার ঘরে ঘুম হয় না। কী যে ছেলেমানষী কর!—আর হারিকেন আনলেই বা কি হবে, বেড-স্বুইচ্ লাগালেই বা হবে কি? ইংরেজ পণ্ডিতেরা বলেন,—যদি কোনো মুক্ত আত্মা—সে এখন জয়দেবের মায়েরই হোক্, কি পরাশরের টাঁ'গ দিদিরই হোক্—মশারির ভেতর উঁকি মারবার দুরভিসন্ধিতে খোলা দরজা কিম্বা জানালা দিয়ে কোনো বিবাহিত ভদ্র লোকের শোবার ঘরে ঢুকেই পড়ে, তা' হলে সে ঘরে হারিকেন জ্বালানো থাকলে সে আলো তক্ষণি নিভে যাবে! তেঁপো বেড্-স্বুইচ্,—কিন্তু আলো কক্ষনো জ্বলবে না—আর জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা কি বলেন জানো?

"কি বলেন?"

"জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা বলেন, যে-ঘরে দু'খানা খাট এক সঙ্গে জোড়া করা থাকে সেই ঘরে ঢোকবার আগ্রহই মুক্ত আত্মাদের খুব অধিক হয়ে থাকে। এমন কি সে ঘরের দরজা জানালা যদি বন্ধও থাকে, তবে নর্দ্দমা কিম্বা ভেন্টিলেটার—যেখান দিয়েই হোক্—সে ঘরে তারা নিগঘাত ঢুকবেই ঢুকবে।"

এক ঝলক অবিশ্বাসের হাসি গায়ে আসিয়া পড়িল। বুঝিলাম একটু অধিক বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই।—

"হ্যাঁঃ! মরণ আর কি! জার্ম্মাণির পণ্ডিতেরা এসে তোমায়

কাণে কাণে ওকথা বলে গিয়েছিলেন বোধ হয়। অমন পণ্ডিতদের মুখে আগুন! জার্ম্মাণির ঐ সব শেয়াল-পণ্ডিতদের জোড়া খাটের ওপর তাদের দেশের সব ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী নজর দিক গে!"

স্ত্রীলোকটির নিছক স্ত্রীলোকের মত কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইল। তবু, হাসিয়া ফেলিলে সমস্তই ফাঁসিয়া যাইবে ভাবিয়া, কষ্টেসৃষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলাম—"ঐ ত মস্ত ভুল করে বসলে। এ কি আর তোমার বাপের বাড়ীর দেশের বামুন-পণ্ডিত পেলে যে, চাল-কলার যোগাড় থাক আর না-ই থাক,—একটি ফাঁদালো নথ্‌ওয়ালী ব্রাহ্মণী ঠিক মাথায় নেপ্টে আছেন। আরে, ও-হলো গিয়ে তোমার জার্ম্মাণ দেশ। দেখেচ ত জার্ম্মাণ-কাইজারের চেহারাখানা। গোঁফ নয় ত যেন দুখানা আঁষ-বঁটি বিশ্ব-সৃষ্টি সংহার করবার জন্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠেচে! পণ্ডিত, মূর্খ,—সৈন্য, সামন্ত,—স্ত্রী, পুরুষ—সবাই ওরা অম্নি জবরদস্ত! বে থা সহজে কেউ করেই না। জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা ত বিয়ের নামেই অগ্নিশর্ম্মা! ওরা বিয়েও করে না, ওদের জোড়া-খাটেরও বালাই নেই!"

আর এক ঝলক ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি দেহে যেন হুল ফুটাইয়া গেল।

"নাঃ, তা কি আর! জার্ম্মাণীর পণ্ডিতেরা বিয়েও করে না,

থা ও করে না, কিছুই করে না! বে থা করে না ত ওদের পণ্ডিত-বংশ লোপ পায় না কেন, বল দিকি? বে থা আবার ত্রিভুবনে কেউ না করে! জার্ম্মাণীর পণ্ডিতেরা সব ঘাস খেয়ে মানুষ হয়েচে বোধ হয়?”

বিবাহ করার সঙ্গে তৃণগুল্ম ভোজন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবার সম্বন্ধটা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিব করিব ভাবিতেছি, এমন সময় এক ধমক—“থামো বাপু, থামো। তোমার বক্তৃতাটা দয়া করে থামাও। বকবক কত্তে পেলে আর কিচ্ছুটি চাও না, কেমন? এখন একটু কষ্ট করে যদি ঐ জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো, আর সুইচ্‌টা অম্নি টিপে আলোটাও জ্বেলে দিয়ে এসো। মেয়েটার কি আক্কেল গা! কাঁদতে হয় আপনার ঘরে বসে কাঁদগে না বাপু! ঐ দেখ, এইবার আমাদের দোর-গোড়ায় এসেই সুরু করেচে। দোহাই তোমার, শীগগির জানালাটা বন্ধ করে, আলোটা জ্বেলে দিয়ে এসো।”

বুঝিলাম, এইবার হুকুম তামিল করিতেই হইবে। কেন না ঐ বিলাপরতা পথচারিণী, বোধ হয় শোকাধিক্য বশতঃ কিয়ংকাল নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করিয়া, আমাদের বাড়ীর নিকটে আসিয়া বাস্তবিকই হঠাৎ অতি উচ্চৈস্বরে রোদন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।—“জন্মদুখিনী মা আমার, কেন এই হতভাগিনীর পোড়া-পেটে তুই জন্মেছিলিরে—মা গো!—ওরে ও জয়দেবের মা,

তোর ঐ সিঁদুর-মাখানো চুলের রাশি, আর আলতা-পরা সোনার পা দুখানি—আমি কেমন করে ভুলবো গো, মাগোঃ! তোর দুধের বাছা—জয়দেব, চাঁদমুখে কত না মা মা বলে ডাকলে—তুই কেমন করে চোখ বুজে রইলি গো, মাগোঃ!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। গৌরী টানিয়া পাশে বসাইয়া বলিল—"একটু থামো। আহা, অভাগিনী মেয়ে খুইয়ে কি কান্নাই কাঁদচে। এই ত সংসার! স্নেহ, মমতা ভালবাসা—সবই মিথ্যে। কেউ কারো নয়। যার যখন সময় হয়ে আসে সব ফেলে রেখে সে অমনি চলে যায়। কারো দিকে আর ফিরেও তাকায় না"।

সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। মন্তব্য অনাবশ্যক বোধে মুখ বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। বিশেষতঃ, যখন বুঝিতে পারিলাম গৃহিণীর মাতৃত্বে এইবার আঘাত পড়িয়াছে, তখন প্রতিকূলে কিছু বলিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র। চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। গৌরী বলিয়া যাইতে লাগিল—"আহা, বুড়ো মানুষ! কোথায় মেয়ে, নাতি, নাতনী সবাইকে বেঁচেবর্ত্তে থাকতে দেখে নিজেই চোখ বুজবে,—না কোথা থেকে পোড়া-কপালে যম এসে কচি মেয়েটাকেই গ্রাস করে বসলে গা"!

হয় ত শেষ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই থাকিতাম। কিন্তু গৌরীর একটা কথায় আমার রসনা সংযত করা কঠিন হইল। গিন্নি

বলেন কি ! যে স্ত্রীলোকটী পথে ক্রন্দন করিতেছে তাহার বয়স, কণ্ঠস্বর হইতে যতটা অনুমান করা সম্ভব, কিছুতেই তিন কুড়ির কম হইবে না। তবেই, যে বৃদ্ধার বয়স ষাট, দেশের উর্ব্বরতা বিবেচনায়, তাহার কন্যা, ঐ জয়দেব জননীর বয়স কিছুতেই চল্লিশ পরতাল্লিশের কম হইবে না। গৃহিণী বলেন কিনা 'কচি মেয়ে'। এত বড় ভ্রমাত্মক ও অশোভন কথা যিনি নিরাপত্তিতে, নীরবে, গ্রহণ করিবেন তিনি গৃহিণীর স্বামীই হউন আর যাহাই হউন প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে রজকাশ্রিত, লম্বকর্ণ শীতলাবাহনটির প্রভেদ অতি যৎসামান্য ! সুতরাং যথাশীঘ্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"দূর ছাই, কি যে বলো, তার না আছে মাথা, আর না আছে মুণ্ডু ! 'কচি মেয়ে' আবার পেলে কোথা থেকে ? যে মেয়েটা মরেচে, তার বয়স নিঃসন্দেহে পঞ্চাশের কাছাকাছি"।

গৌরী চকিতে আমার দিকে ঘুরিয়া বসিল। তৎপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, প্রশ্ন করিল—"কি করে জানলে" ?

"অতি সহজে"।

"তবু শুনি কি করে"।

"পথের ঐ স্ত্রীলোকটির বয়স কত হবে তোমার অনুমান হয়" ?

"বুড়ো মানুষ—সে ত অনায়াসেই বোঝা যাচ্চে। ষাটের কাছে হওয়া আশ্চর্য্য নয়"।

"তোমার অনুমান যথার্থ। আমাব সঙ্গে মিলেচে। আচ্ছা, তোমার এই অনুমান কি শুধু আন্দাজের ওপর, না তার কোনো যুক্তি আছে" ?

প্রশ্ন করিয়া আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল উত্তর শুনিতে পাইব—"আন্দাজের ওপব"। কেন না, দীর্ঘকাল অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ অল্প বয়স্কা যাঁহারা, কোমর আঁটিয়া যৌবনের জোরে তর্ক করিতে সবিশেষ পটু হইলেও, যুক্তির দিক দিয়া যাচাইয়া দেখিলে তাঁহারা একেবারেই কুপোকাৎ! কিন্তু গৌরীর উত্তরে আশ্চর্য্য হইতে হইল।—

"যুক্তি আছে বই কি"।

সহসা মস্তকে কণ্ডূয়ন বোধ হওয়ায় আমি অতি তৎপরতার সহিত উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে করিতে ভাবিলাম—'দাড়াও লক্ষীটি, তোমার চাতুরী ফাঁস করিয়া দিতেছি। তুমি মনে করিয়াছ তোমার যুক্তি আছে শুনিয়াই আমি উহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইব। ওসব চালাকি আমার কিছু কিছু জানা আছে। যুক্তি তোমার যাহা আছে, তাহা শ্রীহরি জানেন'! মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলাম—

"তোমার বহুমূল্যবান যুক্তিগুলি একটু শুনি"।

এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ না করিয়া গৌরী বলিয়া যাইতে লাগিল—

শীতের একরাত্রি

"প্রথম যুক্তি,—স্ত্রীলোকটি নিজেই এই বলে দুঃখ করছিল যে সে বুড়ী, যম তাকে কেন নিলে না। দ্বিতীয় যুক্তি,—সে যখন এই দুপুর রাতে একলা পথে বেরুতে দ্বিধা করেনি, তখন তা'র বয়স নিশ্চয়ই দ্বিধা সঙ্কোচের সীমা অতিক্রম করেচে। তৃতীয় যুক্তি,—তা'র গলার শব্দেই তা'র বয়স কতকটা ধরা পড়েচে"।

প্রথম যুক্তি দুইটির সারবত্তা আমাকে বোধ করি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিছুকাল আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তৃতীয় যুক্তিটি অবশ্য আমিও ভাবিয়াছিলাম। প্রথম দুইটি যে আমার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয়, নিতান্ত ছেলে মানুষী যুক্তি বলিয়াই উহারা আমার পরিপক্ক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই! যাহা হউক, অধিকক্ষণ নীরব থাকিলে পাছে গৃহিণী মনে করিয়া বসেন যে তাঁর যুক্তির তীক্ষ্ণতায় আমায় তাক্ লাগিয়া গিয়াছে, তাই তাড়াতাড়ি ক্ষণিকের স্তব্ধতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলাম—"তবেই দেখ, যে স্ত্রীলোকের বয়স তুমিও বলছ ষাটের কাছে, তার মেয়ে নিতান্ত "কচি" কখনই হতে পারে না। আমাদের এই বাংলা দেশটা অত্যন্ত উর্ব্বর বলে এদেশের মেয়েরাও বেশীর ভাগ তোমার মত অল্প বয়সেই জননী হয়ে বসে থাকেন। সুতরাং যদি ধরে নি ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির বয়স এখন

পনেরো ষোলো তখন তার এই মেয়ে জন্মেছিল, তবে সে মেয়ের বয়স আজ পঞ্চাশের কাছাকাছিই হলো। হলো কিনা? তুমি ত 'কচি মেয়ে' 'কচি মেয়ে' বলে কতই দুঃখ করছিলে"।

"হয় ত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমি যে জয়দেবের মায়ের বয়স অল্প ঠাউরেচি তার কারণ বা যুক্তি আলাদা"।

"আলাদা আবার কি যুক্তি ছাই? আমি যে সব যুক্তি দেখালাম সে সব একেবারে মোক্ষম। একেই ইংরেজীতে বলে "ডিডাকশান"। ডিডাকশানের ওপর যে-সব যুক্তি প্রতিষ্ঠিত সে গুলো একেবারে ধ্রুব সত্য। ওদের আর নড়চড় নেই। এই ডিডাকশানের জোরে একজন ইংরেজ গোয়েন্দা যে কত খুনী জোচ্চোর বদমাইসকে শ্রীঘর দেখিয়ে ছেড়েচেন তা' যদি জানতে তবে আর আমার যুক্তির ওপর কথা বলতে না। ঐ গোয়েন্দার নাম ছিল শার্লক হোম্‌স্‌" !!

"আমি কি আর তোমার যুক্তির ওপর কথা বলেচি? আমি ত মেনেই নিচ্চি তোমার যুক্তিই ঠিক। আমি শুধু বলছিলাম যে ঐ জয়দেবের মায়ের যে বয়স অল্প আমি ঠাউরেচি তার যুক্তি আলাদা। সে যুক্তির নাম ডিডাক সেন, কি গৌরী সেন, তা' আমি বলতে পারিনে" !

মনে মনে হাসিতে হইল। হায় অদৃষ্ট! যিনি সামান্য 'ডিড্রাকশান' কথাটা উচ্চারণই করিতে পারে না, তাঁর আবার

যুক্তি, তাঁর আবার আমার সঙ্গে টক্কর দিতে আসা! মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম—"তোমার যুক্তিগুলির কি নাম তা' তুমি না জান, আমি জানি। শ্রীমতী গৌরীর সুযুক্তি গুলির নাম ডিডাক সেন না হয়ে গৌরী সেন হবার সম্ভাবনাই অধিক। —শুনি তোমার আলাদা যুক্তিগুলি"।

"আচ্ছা, ঐ বইয়ের বাইরে, জয়দেব নামটা কি আজ কাল কারো শুনেচ"?

"মনে ত হয় না। এটা একটা হাল ফ্যাশানের নাম। 'জয়দেব' নাম জয়দেবেরই ছিল। সেকালে কি একালে এই নাম আর কারো ছিল বা আছে এমন আমার জানা নেই"।

"আমারও তাই বিশ্বাস। আচ্ছা, বায়োস্কোপে আমাকে "জয়দেব" দেখাতে কবে নিয়ে গিয়েছিলে মনে আছে"?

"বছর দুই হবে বই কি"।

"হ্যাঁ, ঠিক দু' বছর আগে। চাই কি মাস খানেক বেশীও হতে পারে। যে সময়ে বায়োস্কোপে "জয়দেব" দেখান হচ্চিল, তখন,—এই যে মেয়েটি মরেচে,—সে ছিল পূর্ণ গর্ভবতী। যখন তার ছেলে হলো, তখন ঐ "জয়দেব" নামটা সবা'র মুখে মুখে ছিল বলে তার ছেলের ঐ নামটাই রাখা খুব স্বাভাবিক। তা-ই যদি হয়, তবে এই জয়দেবের বয়স কিছুতেই আড়াই কি তিন বছরের বেশী নয়। বুড়ী সে জন্যেই আক্ষেপ করে কাঁদছিল—

"তোর দুধের বাছা জয়দেব চাঁদ মুখে কত না মা মা বলে ডাকলে"। আহা; দুধের বাছা-ই ত; দু তিন বছরেরটি সবে। বলতে গেলে মা কি বস্তু চিনলে না। তারপর, তুমিই বলছিলে, আজ কাল অল্প বয়সেই মেয়েরা সন্তানবতী হ'য়ে থাকে। এ বিষয়ে মেয়েদেরই দোষ সম্পূর্ণ, কি পুরুষদেরও কিছু কিছু অংশ আছে, সে আলোচনা আর তুলবো না। তবে, তোমার যুক্তির ওপরই যদি আমার যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলি যে, চোদ্দ কি পনেরো বছরের সময় জয়দেবের মা জয়দেবকে পেটে ধরেছিল, তবে তার বয়স আজ কিছুতেই সতেরো আঠারোর বেশী হয় না। মেয়েটাকে 'কচি' বলার এই আমার যুক্তি।—যাক্, যে যাবার সে ত গেলই, ছেলেটারই হলো এখন মুস্কিল। দুধের বাছা, মা হারালো, আহাহা"—বলিতে বলিতে গৌরীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।—দেখিলাম সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিদ্রিত শিশুটিকে বক্ষের নীচে আঁকড়াইয়া ঘন ঘন তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল।—"টুনু, টুনু, আমার টুনটুনি পাখী, আজ যদি ধন মা-মণি তোমার পাশে না থাকে, ভা-রি কষ্ট হবে তোমার, না বাবা? কে-ই বা তোমাকে দুদু দেবে, কাকে-ই বা তুমি গলা জড়িয়ে 'মাম্মা' 'মাম্মা' বলে আদর করবে? সোনা আমার,—মাণিক আমার,—ধন আমার,—চাঁদ আমার"।—সোহাগের ধাপে ধাপে শিশুটির দক্ষিণ গণ্ডে, বাম গণ্ডে, মুখে, চোখে সর্ব্বত্র শ্রাবণের

বারিধারার ন্যায় স্নেহচুম্বনগুলি সশব্দে বর্ষিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ শীতকালের সুনিদ্রার এইরূপ অমার্জ্জনীয় ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় উপযুক্ত বংশধরটি ঘুমঘোরে বারকয়েক চ্যাঁ ভ্যাঁ করিবার আয়োজন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাতের কারণ দূরীভূত হইল না দেখিয়া অগত্যা একটি দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের মত চারিটি হাত পা চারি কোণের দিকে প্রসারিত করিয়া রাবণ-রাজার নিদ্রাবিলাসী সহোদরটির অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় পুনরায় গাঢ় নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল।

তর্কযুক্তির কচকচির ভিতর হঠাৎ এই প্রকার করুণ-রসের আবির্ভাব হওয়ায় আমি প্রমাদ গণিলাম। পূর্ব্বের আবহাওয়া পুনরায় সৃষ্টি করিবার মানসে তাড়াতাড়ি বলিতে হইল—"যে সকল যুক্তি দেখিয়ে তুমি পঞ্চাশ বছরের বুড়ীকে সতেরো বছরের যুবতীতে পরিণত করলে, সে সব ত যুক্তি নয়ই, সে সব ঢেঁকি" !

গৌরী পুত্রটিকে বুকের নীচে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথা কর্ণে প্রবেশ করিতেই ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সে আমার গা ঘেঁষিয়া বসিল। তারপর বলিল—"সাত হাত লম্বা, পাচ হাত চওড়া লেপখানা তুমি একা গায়ে দিয়ে আছ, আর আমি শীতে জমে যাচ্ছি। ইস্, কী কনকনে ঠাণ্ডাই পড়েচে। দাওনা বাপু আমায় একটু লেপ ছেড়ে"।

"বিলক্ষণ! এই নাও, এই নাও" বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি অর্দ্ধেকটা লেপ তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ত্বরিতহস্তে গৌরীর দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলাম—সমস্তই তুহিন-শীতল। আপনার স্বার্থপরতায় বিষম লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"কী স্বার্থপর আমি গৌরী, তুমি দারুণ-শীতে কষ্ট পাচ্ছিলে, আর আমি লেপ গায়ে দিয়ে আরাম করছিলাম। তুমি কেন আগেই লেপটা টেনে নাওনি"?

"এতক্ষণ যুক্তিতর্কেই গরম হয়েছিলাম কিনা! ঠাণ্ডা একটুও টের পাই নি। যুক্তিতর্কও থামল, শীতও এসে চিমটি কাটতে লাগল। এই ত, লেপ গায়ে দিয়ে শরীরটা এখনই বেশ চনচনে হয়ে উঠবে" বলিয়া সে স্মিতমুখে আমার অর্দ্ধ-ত্যক্ত লেপ দিয়া দেহ যথাসম্ভব আবৃত করিয়া বসিল। কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া শেষে বলিল—"কি ঢেঁকি বলছিলে"?

"তোমার ঐ সব অদ্ভুত যুক্তি—যা দিয়ে তুমি প্রমাণ করতে চাও জয়দেবের মায়ের বয়স সতেরো কি আঠারো"।

"প্রমাণ আমি কিছুই করতে চাইনে। আমি কতটুকুই বা বুঝি। তবে, যেটুকু আমার সহজ বুদ্ধিতে এসেচে, সেটুকুই তোমায় বলেছি। তুমি এত বড় বিদ্বান; চার পাঁচটা পাস দিয়েচ; তোমার যুক্তি, তোমার অনুমান সত্য হবে না ত

কি সত্য হবে আমার মত অল্প-লেখাপড়া-জানা মেয়ে মানুষের কথা” ? বলিয়া গৃহিণী নীরবে হাসিতে লাগিলেন।

আমি উত্তর দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। উত্তমার্দ্ধেরা বোধ করি আবহমান কাল হইতেই এই প্রকারে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উপায়হীন অধমার্দ্ধদিগকে পরাভূত করিয়া আসিতেছেন।

গৌরী আমার দেহসংলগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। তাহার শরীরের উত্তাপ আমি শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছিলাম। সেই উত্তাপের কোনো মাদকতা ছিল কি না বলিতে পারি না। নিশ্চয়ই ছিল। কেন না, উপাধান হইতে আমার মস্তকটি সহসা তুলিয়া লইয়া উহা একেবারে গৌরীর কোলের উপর চালান করিয়া দিয়া, তাহার সহাস্য-নতদৃষ্টির সহিত আপনার দৃষ্টি মিলাইয়া, বলিলাম—“কি, হাসচো যে বড় ? অত হাসির ঢেউ উঠল যে ? তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েচি বলে ?——আঃ, কি চমৎকার যে লাগচে, গৌরী ! তোমার এই কোলের কাছে বালিশ টালিশ কিচ্ছু লাগে না। আঃ, তুমি আর আমি, আর ঐ ক্ষুদেটা এম্নি করে,—অনন্তকাল—অনন্তকাল ধরে, অসীমের পথে যেন ভেসে যেতে পারি” বলিয়া, মনের আবেগে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

কতক্ষণ এই অবস্থায় কাটিল বলিতে পারিব না। যখন চক্ষু

অন্দরের আলো

মেলিয়া চাহিলাম, তখন পথের আলো নিভিয়া গিয়াছে। দক্ষিণের জানালা দিয়া উষার ম্লানচ্ছায়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল।
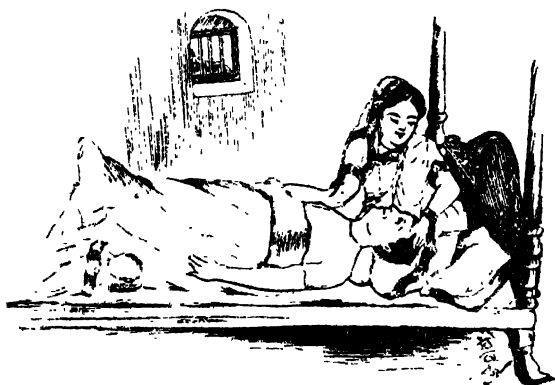
তুমি আর আমি আর ঐ ক্ষুদেটা।

আমাদের পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ কর্ত্তা মহাশয় খড়মের খটাখট্ শব্দে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন শুনিতে পাইলাম। তারপর কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আরে, কে ও, দীনবন্ধু যে! এত সকালে, ভালো করে ফর্সা হতে না হতেই, চলেছ কোথায়"?

শীতের একরাত্রি

"যাচ্ছি না খুড়ো, বাড়ী ফিরচি। মধুর মেয়েটা কাল রাতে মারা গেছে শোন নি? এই সব শেষ করে শ্মশান থেকে ফিরচি"।

"কোন মেয়েটি হে? ঐ ও পাড়ার বনমালী ঘোষের গেঁজেল ছেলেটার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল"?

"হ্যা খুড়ো"।

"আহাহা, সতেরো আঠারো বছরের জ্বলজ্যান্ত মেয়েটা! বলতে গেলে আমাদের চোখের ওপরই মানুষ হতে দেখলুম। ছোট বেলায় ওর বাবার সঙ্গে কতদিন যে আমাদের বাড়ী এসেচে তা' বলতে পারিনে। খাসা মেয়েটি ছিল হে। মেয়ে নয় ত, যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা! ওর বাপ ওকে 'শতা' 'শতা' বলে ডাকত না"?

"হ্যা; নাম ছিল কিনা শতদলবাসিনী"।

"আহা, শতদলবাসিনীই ছিল বটে। কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে পড়েছিল এক চাঁড়ালের হাতে"।

"এখন ফ্যাসাদ হয়েছে খুড়ো এক রত্তি ছেলেটাকে নিয়ে। দরদী কেউ নেই বলতে গেলে। কে-ই বা দেখে, কে-ই বা শোনে"।

"আবার একটা ছেলেও হয়েছিল?—তবে ত কষ্টের আর অবধি নেই। বয়স কত"?

অন্দরের আলো

"এই সবে তুই পেরিয়ে তিনে পড়েচে"।

"আহাহা! দুধের বাছাটার ত তা হলে দুর্গতির একশেষ হবে। দেখা শোনার ভার এখন যাদের ওপর পড়ল তারা সব কসাই!—মেয়েটি কিসে মারা গেল"?

"কিসে আর মারা যাবে! এ এক রকম একটা মানুষকে হাত-পা বেঁধে খুন করা। অসুখ বিসুখ কিচ্ছু না।—পূর্ণমাস ছিল। কাল সকালে বেদনা ওঠে। চোপরদিন মেয়েটা ব্যথায় লুটোপুটি করেচে।—তা, না ডাক্তার, না ধাত্রী, না কিছু। সন্ধ্যে থেকে ফিট হতে লাগল। তারপর, আটটার সময়, কাটা-ছাগলের মত ধড়ফড়িয়ে মেয়েটা চিরদিনের জন্যে চোখ বুজলে"।

"ইস্! ওরা মানুষ, না পিশাচ! শুনে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে! তা, ওরা ডাক্তার-বদ্দি না ডেকেছিল, তোমরা কেন সে ব্যবস্থা করনি"?

"আমাদের কি আর খবর দিয়েছিল মনে করেচ? একটা খবরও পাঠায়নি,—এম্নি শয়তান ওরা। শেষে, সব যখন ফুরিয়েচে, তখন শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের ডাক এলো। মেয়ের বুড়ী-মা যখন ঘটনাটা শুনলে, তখন সে পাগলের মত ছুটে গেছল। গিয়ে তখন দেখে,—সব শেষ। মৃতদেহ উঠোনে বার করা হয়েচে।—এক ফোঁটা ছেলেটা—ভাল করে কিছুই ছাই বোঝে না—মাকে ঠেলাঠেলি করচে,—আর মা মা করে

কেঁদে সারা হচ্চে। বুড়ী আর কত সইবে? সেও অমনি অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন তার জ্ঞান হলো, মৃতদেহ তখন শ্মশানে পুড়চে। বুড়ী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে অনেক রাতে বাড়ী ফিরেচে। শুন্তে পেলাম জয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে কত না জামায়ের, কত না বেয়ানদের হাতে পায়ে ধরাধরি করেচে। কিন্তু পিশাচেরা নিয়ে যেতে দেখনি ;—বলেছে, তাদের ছেলে তাঁদের কাছেই থাকবে"।

"সকাল বেলা কি খবরটাই শোনালে হে! আজ আর মুখে অন্ন উঠবে না। জয়া বুঝি ঐ ছেলেটার নাম"?

"হ্যাঁ; 'জয়া' 'জয়া' বলেই ওকে সবাই ডাকত। পূরো নাম ছিল 'জয়দেব'। যে বছর ছবিতে "জয়দেব" দেখান হয়েছিল সেই বছরই ছেলেটা জন্মেছিল বলে ওর মা আদর করে ওকে ঐ নামটাই দিয়েছিল"।

"ইস, কি পাষণ্ড! কি পিশাচ!! অনন্ত নরকও ওদের যথেষ্ট শাস্তি নয়। আমাদের সমাজ কি আছে, না মরেচে! ভগবানের শাস্তি?—সে ত পরে। তোমাদের সমাজপতিরা এর কি ব্যবস্থা করচেন"?

"ব্যবস্থা করচেন ছাই। এ রকম ঘটনা ত অহরহই ঘটচে। কে আর মরা-মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্চে বল? সমাজের যদি শাসনই থাকবে, তবে এসব অমানুষিক কাণ্ড কখনো ঘটতে পারে"?

"মিথ্যে বলোনি। সমাজ বলতে আজ কাল আর কিছুই নেই। সব "যার যার তার তার" ভাব। সেই জন্যে আমাদের দুর্গতিরও সীমা নেই। যাও তুমি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর শীতভোগ করো না"।

তুমি কি কাঁদচো ?

দীনবন্ধু বোধ করি ইহার পর চলিয়া গেল। কেন না, আর কোনো কথা আমি শুনিতে পাইলাম না।

গৌরীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া স্থাণুর ন্যায় বসিয়া আছে। তাড়াতাড়ি তাহার মুখের

উপর হইতে অঞ্চলটা সরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"তুমি কি কাঁদচো গৌরী? নাও, নাও, এইবার একটু ঘুমোও। সমস্ত রাত এক রকম জেগেই ত কাটালে"।

"নাঃ, ঘুম আর হবে না। অনেকটা বেলা হয়ে গেল বোধ করি। কাপড় ছেড়ে এবার তোমাকে চা করে দি" বলিয়া, পূর্ব্ববৎ বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর, আমি বারণ করিবার পূর্ব্বেই, সে দ্বিতীয় কথা না বলিয়া ক্ষিপ্রপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

আর আমি, সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া লেপের ভিতর আত্মগোপন করিয়া, আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

০ ০ ০

০ ০

০
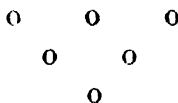
পাণিনির পরাজয়

বিরল-বসতি কানা-গলিটির এক প্রান্তে, ভিনিসিয়ান-রেড-রঞ্জিত, একখানি মাঝারি গোছের দ্বিতল বাড়ি। এই বাড়ির উপরের তলায় আবার একটি মাঝারি রকমের ঘর।

ঘরের একপাশে একখানা খাট। খাটের উপর ধব্‌ধবে বিছানা পরিপাটি করিয়া রচিত।

দেওয়ালের গায়ে একটি আলমারি,—বইয়ে ঠাসা। অপর দিকে একটি বুক্‌-কেশ,—কাপড় জামায় ভর্ত্তি।

বাহির হইতে দেখা যায় না, কিন্তু ঘরে ঢুকিলেই চোখে পড়ে, দক্ষিণে, দেওয়ালে ঝুলান একটি শেল্‌ফ। উহার স্তরে স্তরে

রঙবেরঙের পুতুল ও খেলনা সজ্জিত ;—গরু, ঘোড়া, মুরগী, মোটর-গাড়ি, এরোপ্লেন,—এই সব।

গৃহের বামে, ঘরে প্রবেশ করিবার দরজার দিকে মুখ করিয়া, গৃহস্বামী শশীবাবু ইজি-চেয়ারে দেহ এলাইয়া একখানা মাসিক পত্রিকা তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন।

বয়সে যুবা হইলেও শশীবাবুকে দেখিতে বালকের ন্যায়। একহারা ছিপছিপে গড়ন ; রঙ একপ্রকার ফরসাই। তবে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নহে ; যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম। ত্রিশ বৎসর বয়সেও শশীবাবুর গোঁপ জোড়া বিশেষ কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রথম যৌবনের গোঁপের রেখাটি আজও তাই রেখামাত্রই রহিয়া গিয়াছে। যেন সুনিপুণ কোনো চিত্রকরের তুলির একটি টান !

বাটীর একতলা হইতে দুগ্ধপূর্ণ কোনো পাত্র ও ঝিনুকের সংঘাতজনিত শব্দের ন্যায় একটা টুং টাং শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী কোনো শিশুর উচ্চ চীৎকার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। শশীবাবুর মাসিক পত্রিকা পড়া বুঝি আর হয় না।

শিশুর চীৎকার উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া শশীবাবু পাঠ স্থগিত রাখিয়া একতলার উদ্দেশে হাঁকিলেন—

"আঃ হা, আজ বাড়িতে কি ডাকাত প'ড়্চে, এ্যাঁ! দেখ

দেখি একবার চেঁচামেচির বহরটা? বলি হ'ল কি তোমাদের? ছুটীর দিন; আপিস-টাপিস নেই। একটু নিশ্চিন্তে ব'সে যে একখানা বই পড়বো, তারও যো নেই দেখচি"।

গৃহস্বামীর তম্বিতে একতলায় বাটি-ঝিনুকের টুং টাং ও শিশুর উচ্চ চীৎকার যুগপৎ থামিয়া গেল।

আপনার হুমকির এবম্বিধ আশু কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া শশীবাবু ঈষৎ হাস্য করিলেন। তারপর কি মনে করিয়া, পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ ভৃত্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—"ওরে ও গজানন, গজানন। হতভাগারা সব আজ গেল কোন চুলোয়! এই গজা!"

এক মিনিট পরে ঘরের বাহিরে কাহারো পদশব্দ শোনা গেল। গজানন আসিয়াছে মনে করিয়া শশীবাবু বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাটা উড়ে, কানে তুলো গুঁজে ব'সে থাক! টিকি ধরে যেদিন মাথায় পাক—"

বাম হস্তে ফুটফুটে, হৃষ্টপুষ্ট, একটি তিন বৎসরের উলঙ্গ শিশুর প্রকোষ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরিয়া ও দক্ষিণহস্তে দুগ্ধপূর্ণ একটি বাটি লইয়া এক বিংশতিবর্ষীয়া তন্বঙ্গী যুবতী কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভৃত্য গজাননের পরিবর্ত্তে স্ত্রী মলিনাকে পুত্রসহ উপস্থিত দেখিতে পাইয়া শশীবাবু চক্ষের পলকে পরিত্যক্ত পুস্তকখানা

মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া অতি মনোযোগের সহিত উহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার চালাকিটুকু পত্নীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। স্বামীর প্রতি একটা বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া, কতকটা উষ্ণতার

বড় যে ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছিল !

সহিত মলিনা বলিল—"বড় যে ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছিল ! খাওয়াও ত দেখি ছেলেকে তোমার এক ঝিনুক দুধ। বাবা, বাবা ! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, এমন গুণধর ছেলে আর দু'টি

দেখলুম না। কি দস্যি ছেলে গো, কি দস্যি ছেলে! এমন জোর, আমি ত পারিনে ওর সঙ্গে! হবে না আবার; যেমন বাঁশ, তেমন কঞ্চিই ত হবে! ইস্, এই এতক্ষণ ধরে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিটা না করা গেল। কিন্তু উঁহু, ঐ যে এক ঝিনুক গিলে মুখ বুজেচে, কিছুতেই আর হাঁ করবে না।......... রাখলে বই? আমি মরচি বকে বকে, উনি ভারি আরাম করে ইজি-চেয়ারে শুয়ে বই পড়চেন"।

তাড়া খাইয়া, মুখের উপর হইতে বইখানা সরাইলে দেখা গেল শশীবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হাসিতে ঝলমল করিতেছে।

পার্শ্বস্থিত জয়পুরী টিপয়ের উপর বইটা ধপ্ করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শশীবাবু চেয়ারে সটান উঠিয়া বসিলেন। তারপর সহাস্যে ও কৃত্রিম সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন—"আজ্ঞে, আপনার অঞ্চলাশ্রিত এই বৃষের প্রতি কি আদেশ হয়? বাঁশকে কি কঞ্চির পৃষ্ঠে পড়তে হবে? বলুন আপনার কি অভিরুচি, আমি যথোচিত ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করি"।

মধুর ভ্রূভঙ্গি করিয়া যুবতী উত্তর করিল—"কথার ছিরি দেখ না। আমি যেন সাধ করে ওঁকে 'ষাঁড়' বলতে গেছি। কথাটা মুখ দিয়ে ফস্ করে বের হয়ে গেল, কি করবো? তাই বলে আবার খোঁটা দেওয়া!...একে এই বজ্জাত ছেলেটা দগ্ধাচ্চে,

তার উপর উনি এলেন ওঁর মিছরির ছুরি চালাতে। মাগোঃ, মরণ হলেই বাঁচি"। বলিয়া, হাতের দুগ্ধপূর্ণ বাটি ঠন্ করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া, মলিনা উহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তারপর উক্ত শিশুকে জোর করিয়া আপনার ক্রোড়ে শোয়াইয়া, বাম হস্তে তাহার গ্রীবা ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—"দুষ্টু ছেলে কোথাকার, ভাল চাও ত দুধটা খেয়ে নাও। নইলে, বুঝলে কিনা, জুজুবুড়ীর কাছে এক্ষুণি তোমাকে ফেলে দেব।"

শ্রীমান পাণিনি মাতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য যথেষ্ট কসরৎ করিতেছিল। জননীর কঠিন বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র হস্তপদসঞ্চালন বন্ধ করিয়া মায়ের দিকে বড় বড় কালো কালো চোখ দুটি তুলিয়া, পরিষ্কার তিনটি শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—"দুদ—খাবো—না।"

স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মলিনা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"এই নাও, শুনলে ত নিজের কানে? এখন যদি জোরজবরদস্তি করে খাওয়াতে যাই দুধ, এক্ষুণি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। কী যে মুস্কিলে পড়া গেছে এই দুরন্তটাকে নিয়ে!—ওগো, তুমি না হয় একবার বলে দেখ না। তোমার কথায় যদি খায়।—ঐ দেখ, ছেলে কিন্তু এক পা দু'পা করে সরে পড়চে!"

পত্নীর অনুরোধে শশীবাবু মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন—"পাণিনি!"

পাণিনির পরাজয়

শ্রীমান পাণিনি ততক্ষণে চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আহ্বানে সে আর পলাইতে সাহস করিল না। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে সে উত্তর করিল—"আজ্জে"।

কায়দাদুরস্ত উত্তর শুনিয়া ঘরের ভিতর স্বামি-স্ত্রী দুজনায় মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর হাস্য সম্বরণ করিয়া কৃত্রিম কোপের আভাস ফুটাইয়া, শশীবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'বাইরে দাড়িয়েই 'আজ্জে' হচ্চে, বেয়াদব কোথাকার। ঘরের ভেতর বাঘ না ভালুক? শীগগির ঘরে আয়। শুনে যা"।

গুটিগুটি পা ফেলিয়া পাণিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু পিতার নিকট উপস্থিত না হইয়া মাতার পৃষ্ঠদেশে গিয়া দাড়াইল। মলিনার মস্তকে ঈষৎ অবগুণ্ঠন ছিল। একটানে উহা অপসারিত করিয়া শ্রীমান মাতার কবরীস্থিত সোনার কাঁটাগুলির সেন্‌সাস্ লইতে আরম্ভ করিল—"এক, ছয়, তিন, বারো"!

পুত্রকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া মলিনা ক্ষিপ্রহস্তে পুনরায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহার পর সস্মিতমুখে পাণিনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আহা, গুণের আর সীমা নেই। উনি দিয়েছেন তিনটে মোটে সোনার কাঁটা, বাবু গুণে ফেল্লেন বারোটা! তোর বাবুজী মস্ত বড় মানুষ, নয়? একটা দুটো কোন ছার, একেবারে বারো বারোটা সোনার কাঁটা আমায় গড়িয়ে দিয়েছেন, কেমন"?

পত্নীর বাক্যে শশীবাবুর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হইল। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন— "ডাকলুম আমি, সেদিকে খেয়াল নেই ; মায়ের পেছনে গিয়ে কাঁটা গুণতে আরম্ভ করলে ? বড় ডেঁপো ছেলে হয়ে উঠেচ ! এমন ঠেঙ্গানি একদিন দেবো, যে যাকে বলে ! এদিকে, আমার কাছে আয় বলছি ।"

ধীরে ধীরে পাণিনি পিতার দুই জানুর মধ্যদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

শশীবাবু পুত্রের দুইস্কন্ধে আপনার দুই হাত রাখিয়া ডাকিলেন —"পাণিনি" !

'আজ্‌জে" বলিয়া উত্তর দিয়াই খোকা পিতার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মলিনা সহাস্যবদনে শিখাইয়া দিল—'আজ্‌জে' নয় ; বল 'আজ্ঞে'।

পাণিনি জননীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিল— "আজ্‌জে।

"ফের বলে 'আজ্‌জে'। 'আজ্‌জে' নয়, 'আজ্‌জে' নয় ; 'আ-জ্ঞে'। বল 'আজ্ঞে"।

"আ-আ-আ-আজ্‌জে"।

শশীবাবু হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বেশ, বেশ ; ঐ

'আজ্‌জে'তেই আমি আপাততঃ সন্তুষ্ট। আর, ঐ যে ডাকবা-মাত্রই তুমি আমার কাছে এসেচ, এতেও আমি তোমার ওপর খুব প্রসন্ন হয়েচি। তোমার পিতৃভক্তি যথার্থই প্রশংসার বস্তু, বুঝলে ?"

পাণিনি পিতার বক্তৃতায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। শশীবাবু তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—"তোমার গা-ময় দুধ আর কাদা। কোলে যদি ওঠো বাপু, আমার কাপড়চোপড় এই দণ্ডেই গয়াপ্রাপ্ত হবে। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শোনো যা বলছিলাম। তুমি যে তোমার বাপুজীর কথা শোনো, এটা খুব ভালো কথা। সবাই বলবে কি জানো? সবাই বলবে—পাণু বড় লক্ষ্মী-ছেলে; সে তার বাপুজীর কথা শোনে। কিন্তু, তুমি যে তোমার মায়ের কথা শোন না—দুধ খেতে চাও না,—জ্বালাতন কর তাঁকে, এটা আবার অত্যন্ত গর্হিত কথা। এতে আবার সবাই বলবে কি জানো? সবাই বল্‌বে,—পাণুটা ভারী দুষ্টু; সে তার মায়ের কথা শোনে না, দুধ খায় না, খালি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে। পাণুটা পচা, গন্ধ, হ্যাক্—থূঃ।"

পিতার "হ্যাক্ থূঃ" বলিবার হাস্যজনক মুখভঙ্গি দেখিয়া পাণিনি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর মায়ের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিল "মা, মা, বাপুজী বল্‌ছে, 'পাণুটা পচা, গন্ন, হ্যাক্—থূঃ'। এ কথা বলেছে বাপুজী।"

পাণিনির পরাজয়

মলিনা পুত্রকে সস্নেহে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—"না, না, তোমার বাপুজী কিচ্ছু জানে না। পচা, গন্ধ, হ্যাক্—থুঃ আবার! আরো না কিছু!! পাণু আমার লক্ষ্মী ছেলে, চাঁদ ছেলে! কেমন আমার কথা শোনে, ঢক্‌ঢক্ ক'রে দুধ খায়। দেখাও ত বাবা, তোমার বাপুজীকে দেখাও ত, কেমন তোমার গলার ভেতর ময়নাটা বড় হয়েচে।" বলিয়া, জননী পুত্রকে পুনরায় কোলে শোয়াইয়া এক ঝিনুক দুধ তাহার মুখের নিকট ধরিলেন। পাণিনি বিনা আপত্তিতে দুধটা মুখে লইয়া ঢক্ করিয়া উহা গলাধঃকরণ করিল।

মলিনা স্বামীর প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ করিয়া বলিল—"শুনেচ, ওগো শুনেচ, ময়নাটা যে ডাকল? পাণুর গলার ভেতর ময়নাটা দুধ খেয়ে খেয়ে কত বড়টি হয়েচে, দেখলে? কেমন দুধ গলায় যেতেই ঢক্ করে ডেকে উঠল"!

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া শশীবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—"সত্যি ত, সত্যি ত! পাণুর গলার ভেতর সত্যি সত্যি ময়নাটা ডাকল যে!! আরে রামোঃ, দেখেচো একবার কাণ্ডখানা! গলার ভেতর ময়না বসে ঢক্‌ঢক্ করচে। ডাকো, ডাকো শীগগির, রুণু, ঝুণু, রেণু, টুলটুল, নেরু সবাইকে। ওরে অ টুলটুলু, নেরু, রুণু, ঝুণু, রেণু,—শীগগির দৌড়ে এসে দেখ না,—পাণুর গলার ভেতর মস্ত বড় একটা ময়না ঢুকেচে, আর দুধ খেয়ে ঢক্‌ঢক্ করচে।"

ডাকিবামাত্রই এক ঝাঁক নানা আকারের ও নানা বয়সের কাচ্চবাচ্চা "কোথায়, দেখি কাকাবাবু, দেখি কেমন ময়না" বলিয়া, চীৎকার করিতে করিতে দুড়্দাড়্ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রুণু ঝুণু একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া বসিল—"কি ময়না কাকীমা? চড়ুই, না টিয়ে, না শালিক"?

"না, না, চড়ুই, শালিক টালিক নয়; এটা মস্ত বড় একটা পাহাড়ে-ময়না। দেখচিস্‌নে কী জোরে জোরে ডাকচে" বলিয়া, মলিনা ক্ষিপ্রহস্তে চার পাঁচ ঝিনুক দুধ ঢক্‌ঢক্ করিয়া পুত্রকে খাওয়াইয়া দিল।

শ্রীমান খোকা তাহার কণ্ঠবাসী পাহাড়ে-ময়নাটির পরিচয় এই প্রকারে সকলের সাক্ষাতে দিতে পারিয়া মহোল্লাসে এবং সগৌরবে হাত-পা ছুঁড়িয়া জননীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

মলিনা দেখিতে পাইল, এইত উপযুক্ত সুযোগ। এই সুযোগে, পাণিনির ময়নার ডাক শুনাইবার উৎসাহ থাকিতে থাকিতে, অবশিষ্ট দুধটুকু তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু টুলটুল্ সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল।

টুলটুল সাত কি আট বৎসরের মেয়ে। বুদ্ধি একটু হইয়াছে। সে অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে দলস্থ সকলকে বলিল—"না রে, ওটা ময়না নয়; দুধ খাবার ঢক্‌ঢক্ শব্দ। ময়না

বুঝি আবার মানুষের গলার ভেতর থাকে? আমরা সব বোকা কিনা! কিছু যেন বুঝিনে আর! চল্, চল্, আমরা ছাদের ওপর কুমীর-কুমীর খেলা করিগে” বলিয়া, “দলপত্নী” আপনার দল-গুটাইয়া “কুইক্ মার্চ্চ” করিতে করিতে ছাদের দিকে প্রস্থান করিল।

খেলার গন্ধ পাইয়া পাণিনি মায়ের বাহুপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ভীষণ এক স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত করিল!

পুত্রের ব্যস্ততা দেখিয়া মলিনা বলিল—“দুধটুকু খেয়ে নাও, তবে খেলা করতে যেতে পাবে। আর বেশী নেই; এই ক’ ঝিনুক খেয়ে ফেলো। বাস্, তুমিও খালাস, আমিও খালাস। শীগগির শীগগির খেয়ে নাও। উ বাবা! জানো ত ওদের বাড়ির চাঁপুকে লুলুভূতটা কি করেছিল? চাঁপা দুধ খেতে চায়নি; তার মা ডেকে বল্লে,—‘আয়ত রে লুলুভূতু, চাঁপুকে নিয়ে যা ত রে’। আর,—ও মাগো, লুলুভূতু সত্যি সত্যি গট্‌গট্ করে এসে হাজির” !!

পাণিনি কিন্তু এতটুকুতে ভয় পাইবার ছেলে নহে। চোখে মুখে শিশুসুলভ একটা তরল হাসির দীপ্তি ফুটাইয়া সে জননীকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—“লুলুভূতুটা চাঁপাকে কি করেছিল, মা” ?

“চাঁপাকে কি করেছিল? লুলুভূতু চাঁপাকে থলের ভেতর ভরে তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গেছল। তারপর, ছুরি দিয়ে

গট্ গট্ ঘরে এসে হাজির !!

চাঁপার পিঠ কেটে, তেল, নুন, লঙ্কা ঘষে দিয়েছিল! আর, মাগো মা, কী জ্বলুনি, তার কী জ্বলুনি" !!

চাঁপাসুন্দরীর দুর্দ্দশায় শ্রীমান পাণিনির মহাস্ফুর্ত্তি! ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুটি ঘুরাইয়া মুরুব্বীর মত সে জিজ্ঞাসা করিল—"দুষ্টু মেয়েটা কি করলে তখন" ?

"কি করলে চাপু? চাপু 'ওরে বাবারে, ওরে মারে' বলে চেঁচাতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'আমাকে আমার মায়ের কাছে রেখে এসো গো; আমি মায়ের অবাধ্য আর হব না গো; এখন থেকে আমি ঢক্‌ঢক্ করে দুধ খাবো গো'—বাবা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার, খেয়ে নাও ত। বেশী আর নেই; এই দু' ঝিনুক দুধ বই ত নয়। চাঁদ আমার—দেখ, দেখ, পান্নু কেমন দুধ খায়"—বলিতে বলিতে আর তিন ঝিনুক দুধ মলিনা পুত্রের গলায় ঢালিয়া দিল।

জননী যখন চম্পাসুন্দরীর নির্য্যাতন-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিলেন, পুত্রটি তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি, প্রত্যেকটি বাক্য, জ্বলন্ত উৎসাহ সহকারে দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। কল্পনাচক্ষে সে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতেছিল,—বিভীষিকাময় নির্দ্দয় লুলুভূত নামক জীবটি চাঁপাসুন্দরীর কর্ত্তিত পৃষ্ঠদেশে তৈল এবং লঙ্কা মর্দ্দন করিতেছে, আর দুষ্টা মেয়েটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। এমতবস্থায় উৎপীড়িতা চাঁপার দুরবস্থা

স্মরণ করিয়া, পাণিনি দুই তিন ঝিনুক দুগ্ধ নির্ব্বিবাদে কণ্ঠস্থ করিল বটে, কিন্তু চতুর্থ ঝিনুকটি মুখের নিকট আসিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পদাঘাতে জননীর সঝিনুক হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—"আর, টেঁপীকে কি করেছিল মা লুলুভূতু ?"

বকিতে বকিতে মলিনার মুখ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কত প্রকারে সে পুত্রকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টা! ভবী নাহি ভোলে! অগত্যা টেঁপীর কাহিনীটাও তাহাকে বলিতে হইল।

"টেঁপীকে কি করেছিল লুলুভূত? হ্যাঁ—, টেঁপীকেও লুলুভূতুটা থলের ভেতর ভরে তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গেছল। তারপর টেঁপীর গায়ে এই এত বড় এক বাটি গুড় মাখিয়ে দিয়েছিল। গুড় মাখিয়ে শেষে এই বড় বড়, ডেঁয়ে-পিঁপড়ে টেঁপীর গায় ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর আর কি, বড় বড় ডেঁয়ে গুলো কটাস্ কটাস্ করে টেঁপীকে কামড়াতে লাগল। আর, ও মাগো মা! কী জ্বলুনি, তার কী জ্বলুনি !! টেঁপীর সমস্ত গা রক্তের মত লাল হয়ে উঠল, আর গাল-ফুলো গোবিন্দর মায়ের মত এই ঢ্যাব্‌ঢেবে হয়ে ফুলে গেল" !!

শিশুর কৌতূহল দুর্দ্দমনীয়। লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় শতমুখে উহার বিকাশ, পর্ব্বতনিঃসৃতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় দুর্ব্বার,

দুরতিক্রমণীয়। শ্রীমান পাণিনির অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপ্ত হইয়া বল্‌গাহীন অশ্বের ন্যায় একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর চিবুকে হাত রাখিয়া সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"লুলুভুতু টেঁপীকে কি বল্লে" ?

মলিনাকে উত্তর দিতেই হইল।

"টেঁপীকে কি বল্লে লুলুভুতু ? বল্লে, কিগো, লাগ্‌চে কেমন ?

লাগ্‌চে কেমন ?

পিঁপড়ের কামড় খেতে এখন কেমন লাগ্‌চে ? বড় যে দুধ খেতে চাও না ; রোজ রোজই মাকে দুধ খাওয়াবার সময় যে জ্বালাতন

করে মারো, এখন তার কি? দুধ যদি না খাও, খুব পেট ভরে পিঁপড়ের কামড় খাও"!

"টেঁপি কি বল্লে, শুনি"?

"কি আর বলবে; শুধু হাউ, মাউ আর খাউ!—'আর দুধ খেতে কাঁদবো না, মাকে জ্বালাতন করবো না, আমাকে বাড়ি রেখে এসো,—এই বলে কী কান্না! শেষে রেখে এলো লুলুভূতু টেঁপীকে বাড়ি।—শুনলে ত এখন চাঁপা আর টেঁপির কি হাল করেছিল লুলুভূতটা? এখন, এই ক' ঝিনুক দুধ খেয়ে নাও ত লক্ষ্মী,—বাবা আমার, খেয়ে নাও ত সোনামণি"।

পাণিনি মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আর এড়াইতে সাহস করিল না। চাঁপা এবং টেঁপির সে জ্বলন্ত নজীর জননী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন, তাহার পর শ্রীমানের আর এবম্বিধ দুঃসাহস না হইবারই কথা! সুতরাং বিনা আপত্তিতে মুখের নিকট ঝিনুক ঝিনুক দুগ্ধ যেমন আসিতে লাগিল, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পান করিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু গোল বাধিল শেষের তিন চার ঝিনুক দুধ লইয়া। ঐটুকু দুগ্ধের আর গতি হয় না। লুলুভূতের ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী, পিতার তর্জ্জন-গর্জ্জন, মাতার স্নেহের উৎপীড়ন,—একে একে সমস্ত বিফল হইল। পাণিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া জননীর অঙ্কে বসিয়া রহিল। ৮

পাণিনির পরাজয়

এমন সময় দুই বৎসরের রেণু সশব্দে এক খণ্ড ইক্ষু চুষিতে চুষিতে, দরজার বাহিরে আসিয়া দেখা দিল।

মলিনা পুত্রকে কোল হইতে উঠাইয়া, অদূরে উপবিষ্ট স্বামীর দিকে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

"যা চলে আমার কোল থেকে উঠে। দুষ্টু ছেলে কোথাকার! দুধ খাবেন না, কিছু খাবেন না, শুধু শুধু কোলে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবেন। রোজ রোজ দুধ খাওয়াতে একি জ্বালারে বাপু! যেন দুধ খেলে আমার পেট ভরে। আয় ত রে রেণু আমার কোলে। আয়, পাণুর ঐ বড় মোটর-গাড়িটে তোকে দি; দেখবি কেমন চাবি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেই গাড়ি সোঁ-সোঁ করে ছোটে! নিবি তুই ঐ গাড়ি"?

পাণিনির বড় মোটর-গাড়ি! যে গাড়ি শ্রীমান প্রাণাধিক ভালবাসে, এবং যাহাতে অপর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারও নাই। এ-হেন মোটর-গাড়ি লাভ করিবার এই অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীমতী রেণুবালা তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত ইক্ষুখণ্ড সুদূরে নিক্ষেপ করিল, এবং "নেবো কাকীমা, ঐ বল মোতল গালিতা আমি নেবো" বলিয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কাকীমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"নিবি? আচ্ছা, আয় তোকে দি" বলিয়া, মলিনা রেণুকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত

খেলনাপূর্ণ শেল্‌ফের নিকটে উপস্থিত হইয়া অঞ্চলের চাবিদ্বারা উহা উন্মুক্ত করিল।

শ্রীমান পাণিনি এইবার কোনো বাধা না মানিয়া শশীবাবুর কোলে গিয়া বসিয়াছিল। ঐ স্থান হইতে, রেণুকে কোলে লওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেল্‌ফের দ্বারোদঘাটন পর্য্যন্ত, তাহার জননীর প্রত্যেকটি কার্য্য সে স্তব্ধভাবে ও নিতান্ত শুষ্কমুখে লক্ষ্য করিল। কিন্তু যখন সে দেখিতে পাইল সত্য সত্যই রেণু তাহার বড় সাধের মোটর-গাড়িটা আলমারি হইতে বাহির করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মহোৎসাহে উহাতে কট্‌কটা কট্‌কট্ করিয়া চাবি ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ধ্বসিয়া পড়িল। কোনো প্রকারে উত্থিত ক্রন্দনের বেগ ধারণ করিয়া, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—"বাপুজী, আমার মোটর-গাড়ি রেণু নিলে। তুমি আমাকে কিনে দিয়েছিলে না? রেণু নিয়ে নিলে আমার গাড়ি"।

শশীবাবু পুত্রমুখ সস্নেহে চুম্বন করিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন—"তুমি বাবা বড় দুষ্টু হয়েচ। ঐ দুধটুকু খেয়ে ফেল্লেই সব লেঠা চুকে যায়। তুমি দুধটুকু খেলে না বলেই তোমার মা রাগ করে তোমার গাড়ি রেণুকে দিয়ে দিলে। যাও, নিজের হাতে বাটি মুখে তুলে, দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে নাওগে। তা হলে

রেণু তোমার গাড়ি রেখে দেবে নিশ্চয়। যাও, দেখি তুমি কেমন আমার কথা শোনো"।

সুড়্সুড়্ করিয়া শ্রীমান পিতার কোল ত্যাগ করিয়া নামিয়া পড়িল। ধীরে, ধীরে,—নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, দুধের বাটির নিকট গিয়া সে বসিল এবং রেণুর হস্তস্থিত মোটরগাড়ির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, বাটিটা একবার মুখের নিকট তুলিতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই উহা ভূমির উপর রাখিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু আসল খাওয়াটা আর হইল না। বোধ করি এত সহজে পরাভব স্বীকার করিতে তাহার আত্মমর্য্যাদায় বড়ই বাজিতেছিল।

এদিকে অপর পক্ষ একেবারে নাছোড়বান্দা!

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া মলিনা আর এক চাল চালিল।

রেণুর হাত হইতে মোটর-গাড়িটি লইয়া যথাস্থানে উহা স্থাপন করিয়া সে বলিল—"কি হবে ছাই এ মোটর গাড়ি নিয়ে! এটাত আর সত্যিকারের মোটর গাড়ি নয়। তার চেয়ে, এই ডলি-পুতুলটা তুই নেরে রেণু। কেমন মজার পুতুল এটা জানিস? শুইয়ে দিলেই এটা চোখ বুজে থাকে; আবার দাঁড় করিয়ে দাও, এক্ষুণি চোখ মেলে চাইবে, আর বলবে—'মা, মা'! কি মজার পুতুল, নারে? নিবি ওটা?"

রেণু সাগ্রহে চেঁচাইয়া উঠিল—"নেবো, নেবো কাকীমা, আমিও পুতুল নেবো।"

জননীর এই সাংঘাতিক প্রস্তাবে এবং শ্রীমতী রেণুবালার এবম্বিধ কলঙ্কজনক "পরদ্রব্যেষু সন্দেশবৎ" আচরণ দেখিয়া পাণিনির অন্তরাত্মা হায় হায় করিয়া উঠিল। আর এক তিল বিলম্ব বিপজ্জনক। মোটরখানা কোনো প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু আবার একি নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত! আত্ম-মর্য্যাদা উপস্থিত নিজের চরকায় তৈল প্রয়োগ করুক!

চট্ করিয়া বাটিটা মুখের নিকট তুলিয়া ধরিয়া শ্রীমান পাণিনি অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং শূন্য বাটিটা ঠন্ করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া, উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে সে তাহার 'বাপুজীর' নিকট ফিরিয়া গেল।

শশীবাবু পরাজয়ক্লিষ্ট পুত্রের ক্ষুণ্ণ বদন লক্ষ্য করিয়া অন্তরে আঘাত পাইলেন। খোকাকে সস্নেহে বুকে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনার সুরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার পাণু বড় লক্ষ্মী ছেলে।" তাহার পর ধমকের সুরে—"হ্যাঃ, পাণুর ডলি-পুতুল আবার রেণুকে দিতে চায়! যে দেবে, তার হাড় গুড়ো করে ফেলব না? খবরদার, পাণুর পুতুল-টুতুলে হাত দিও না বল্‌চি। হাত কেটে ফেলব! পাণু কেমন আমার কথা শুনে আপনার হাতে দুধটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল্লে"!

কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া মলিনা শেল্‌ফের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর অঞ্চল হইতে দু'টি পয়সা খুলিয়া, রেণুর দুই

হাতে দিয়া বলিল—"যাও ত মা, রুণু, ঝুনু, নেরু, টুলটুল—সবাইকে দেখাওগে,—ছটো পয়সা পেয়েচ।"

শ্রীমতী রেণুবালা অদ্ধআনা ক্যাশ হস্তগত করিয়া ও 'যথালাভ' মনে করিয়া আনন্দে একেবারে 'গদগদ' হইল। তবে তাহার কাকীমার সমস্ত দানেরই অনিত্যতা সে এতক্ষণে একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছিল। মোটর আসিল, মোটর আবার শেল্‌ফের 'গেরাজে' গিয়া প্রবেশ করিল। ডলি-পুতুল হস্তগত হইতে না হইতে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া পলকহীন নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। কি জানি, সম্প্রতিলব্ধ পয়সা ছুটিও যদি পুনরায় তাহার কাকীমার অঞ্চলগত হয়, তবে ছঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না। বুদ্ধিমতী মেয়েটি এই প্রকার সাত পাচ ভাবিয়া সত্বর সেই বিপজ্জনক স্থান হইতে পলায়ন করিল।

রেণু প্রস্থান করিলে, পুত্রের নিকটে আসিয়া মলিনা সহাস্যে গান ধরিল—

পাণু বড় ভালো রে ভালো,
আরও ছুদু ঢালো রে ঢালো,
তাতে চিনি একটু দিয়োগো, বাপুজী,
নইলে, পাণু ছুদু খাবে না, খাবে না।

কেমন, পেটটি ভরেচে এবার? কার পেট ভরল,—তোমার না আমার"?

"তোর"।

"ও বাবা, আবার তুই-তোকারি হচ্চে যে! রাগ হয়েচে বুঝি বাবুর? তা'ত হবেই। আমার পেটটি যখন ভরেচে তখন রাগ ত হবারই কথা। যাক্, আর ভাবনা নেই; আজ চৌপর দিন আমার আর কিছু না খেলেও চলবে!—আচ্ছা, তা যেন হলো; এখন বলো দেখি,—এই যে আমি এতক্ষণ ধরে, কত কষ্ট করে, তোমাকে খাইয়ে আমার পেটটি ভরালুম, তা' আমিই ভালো, না ঐযে তোমার 'বাপুজী', যিনি চুপটি করে বসে তামাসা দেখলেন, আর মুচকে মুচকে হাসলেন,—ঐ বাপুজীই ভালো? বলো কে ভালো,—আমি, না বাপুজী"?

"বাপুজী ভালো"।

"আর আমি"?

"তুই লুলুভূত"!

আপনার উত্তর শুনিয়া খোকা আপনিই হাসিয়া কুটিকুটি।

সেই শিশুসুলভ চপল হাসির সহিত পিতামাতার উচ্চহাস্ত মিলিত হইয়া কক্ষটিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীমান পাণিনির দক্ষিণ গণ্ডে শশীবাবুর ও বাম গণ্ডে মলিনার অজস্র স্নেহ-চুম্বন চৈত্রের করকাধারার ন্যায় সশব্দে নামিয়া আসিল।

সাহিত্য-জমিদার

পোড়া-অদৃষ্ট বুঝি এতদিনের পর সুপ্রসন্ন হইল! বহুদিন অবধি যে-সিদ্ধি লাভের আশায় কাবুলচন্দ্রের একটা গুপ্ত-সাধনা চলিতেছিল, সেই বহুদূরবর্ত্তী সিদ্ধির কেবলমাত্র রথচূড়া দর্শন করিয়াই, আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, সে এমন অসম্ভব রকম হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল যে তাহা আর কহতব্য নহে।

যশোমতী ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণে বসিয়া কর্ত্তার ফরমাশ অনুযায়ী আলু-পটোলের ছক্কার উপযুক্ত তরিতরকারি কুটিতেছিলেন। কাবুলচন্দ্রের হস্তপদের সেই আকস্মিক ব্যায়াম প্রবণতা দর্শন করিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিতা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"কিরে, কিরে কাবুল, অমন ধারা ধেই ধেই নাচচিস যে বড়? থাম্ বাপু, থাম্। অত হুড়্‌দাড়্ করিস নে। উনি ওপরে রয়েচেন; টের পেলে এক্ষুণি আবার লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন। সকাল থেকেই উনি যে রকম রেগেমেগে রয়েচেন তোর ওপর! ফের এ রকম বাঁদর-নাচ নাচতে দেখলে আর আস্ত রাখবেন না"

"উনি", অর্থাৎ কাবুলের পিতা সুবলচন্দ্রের পুত্রের উপর এবম্বিধ জাতক্রোধ হইবার সমূহ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দিবস প্রাতঃকালে, যদ্যপি তিনি এমন সুশোভন লোকের মুখদর্শন করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রমতে গোটা দিনটাই তাঁহার শান্তিতে কাটাইবার কথা, তথাপি এই ঘোর কলিতে শাস্ত্র বচনও কখন কখন ব্যর্থ হয় এই জন্য, কিম্বা অপর কোন অজ্ঞাত-কারণবশতঃ, দিনের প্রারম্ভেই একটা অপ্রীতিকর সংবাদ পাইয়া তিনি একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিলেন।

প্রভাতে চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া সবেমাত্র তিনি প্রশান্তচিত্তে 'অমৃত বাজার' খানা টানিয়া লইয়াছেন, এমন সময় এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসী জ্যেষ্ঠপুত্র হাবুলচন্দ্র অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইতেছে যে অপদার্থ কাবুলচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় ডিগবাজি খাইল।

এমতাবস্থায় সুবলচন্দ্রের যে উক্ত অকালকুষ্মাণ্ডটির প্রতি

প্রভাত হইতেই পিতৃসুলভ অপত্যস্নেহের পরিবর্ত্তে একটা বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিবে, একথা তাঁহার ব্যথার ব্যথী মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য।

যাহা হউক, জননীর বাক্যে কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, কাবুলচন্দ্র পূর্ব্ববৎ পূর্ণোদ্যমে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিল।

বিপদ আশঙ্কা করিয়া অগত্যা যশোমতীকে আলু পটোলের চর্ম্মমোচন স্থগিত রাখিতে হইল। বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া তিনি নৃত্যগোপাল কাবুলচন্দ্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। জননীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া পুত্রটি নৃত্য বন্ধ করিল বটে, কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে মাতাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।—

"আরে রেখে দাও মা তোমার 'ওপরে রয়েচেন' 'ওপরে রয়েচেন।' ওপরে রয়েচেন ত ভারি বয়েই গেছে।—ইস্, লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন আর কি! কই, করুন না দেখি কেমন লাঠি নিয়ে তাড়া! আমি তেমন কাবুলচন্দর কিনা যে ভয়ে ইঁদুরের গর্ত্ত খুঁজতে লেগে যাব"!

যশোমতী গোঁয়ারগোবিন্দ অল্পবুদ্ধি পুত্রটিকে বিলক্ষণ চিনিতেন। কাবুলের স্কন্ধে হাত রাখিয়া তিনি অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

"একটু আস্তে কথা বল্ কাবুল। জানিস ত, বড্ড রাগী মানুষ উনি। সকাল বেলাকার মারগুলো এরিমধ্যে ভুলে গেলি,—হাঁ রে"?

পোঁ পোঁ করে পালাই ?

আরক্তমুখে কাবুল উত্তর দিল—"বেশী ফর্‌ফর্ করো না বলচি। আহা, ভারি ত মার! ওঁর লাঠিকে আমি থোড়াই

কেয়ার করে থাকি। ওপরে না রয়েচেন?—আসুন না তেড়ে, মারুন না ফের লাঠি—”

জননী তাড়াতাড়ি পুত্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া অধিকতর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—“চুপ, চুপ, চুপ কর হতভাগা। খালি তেজ দেখানো? যতই বাপু ‘এসা করেঙ্গে’ ‘তেসা করেঙ্গে’ কর, সবই এই মায়ের কাছে। উনি এলে ত তখন হয় পোঁ পোঁ করে পালাও, নয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাও”।

এক ঝটকায় জননীর হাতখানা মুখের উপর হইতে অপসারিত করিয়া কাবুলচন্দ্র বিকটকণ্ঠে বলিল—“হ্যাঁ, পোঁ পোঁ করে পালাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাই”?

“খাস্ না ত কি? এই ত আজ সকালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্চিলি। এত তেজ তখন কোথা ছিল, শুনি? ভাগ্যিস্ আমি তোদের বাপ-বেটা দুজনার মাঝখানে পড়ে অনেকগুলো ঘা নিজের হাত-পিঠ পেতে নিয়েছিলাম, তাই রক্ষে। নইলে,—এই দ্যাখ, আমার হাতের এই খানটায় কালশিরে পড়েচে, দেখেচিস? পিঠে,—এই জায়গাটায় হাত দিয়ে দ্যাখ, ফুলে উঠেচে কিনা—”।

যশোমতী সহসা দেখিতে পাইলেন পুত্রের মুখ হইতে পূর্ব্বেকার সেই উদ্ধত উত্তেজিত ভাব দূরীভূত হইয়াছে। সেই স্থলে তাহার মুখে চোখে এমন একটা বিষণ্ণতার কালিমা স্পষ্টই

ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহা চোখে পড়িতে এতটুকু বিলম্ব হয় না।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যশোমতী প্রশ্ন করিলেন—"কি হলো আবার? কি ভাবচিস রে কাবুলচাঁদ"?

উত্তর দিতে গিয়া কাবুলচন্দ্রের ঠোঁট দু'খানা বারকয়েক ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল!

"ভাবচি মা, আমি না হয় পরীক্ষায় ফেল করেচি বলে বাবা আমাকে খুব মারধর করলেন। আমি বার বার পরীক্ষায় ফেল করচি; আমার ওপর তাঁর রাগ হতে পারে। কিন্তু মা তুমি ত আর কোনো পরীক্ষা ফেল করনি। তোমাকে কেন উনি এমন করে মেরেচেন, বল ত"?

জননী স্থূলবুদ্ধি নন্দনের কথা শুনিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—

"শোন বোকারামের কথা! আমাকে উনি মারতে যাবেন কেন? মেরেছিলেন তোকে। তবে, তোকে বাঁচাতে গিয়ে কতকগুলো লাঠির ঘা আমারও লভ্য হয়ে গেছে, বুঝেচিস্?—যে এক এক জনার রাগ!—সপাং, সপাং, সপাং—চোখ বুজে মেরেই চলেছেন। সে সব কার পিঠে বে পড়চে, তা দেখার খোঁজ নেই"। বলিয়া, যশোমতী নিঃশব্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু পুত্রটি দস্তুরমত ক্ষেপিয়া উঠিল।

"তুমি আমার হয়ে কেন মার খেতে গেলে? ভারি বাহাদুরী, নয়''?

যে মায়ের পেটে জন্মেছে, সেই মায়ের গলাটি—ঘ্যাঁচ্‌

"বা রে! তোকে ঐ রকম পড়ে পড়ে খুব মার খেতে দেখলে আমার বুঝি খুব ভালো লাগত, কি বলিস্? যাকৃগে ওকথা, এখন একটু ঠাণ্ডা হ' দেখি"।

কাবুলচন্দ্র ঠাণ্ডা হইবার কোনই লক্ষণ দেখাইল না। বরং তাহার উষ্ণতা যে সম্যক বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য সে বলিতে লাগিল—

"দেখ মা, আমি সেদিন একখানা বইয়ে পড়ছিলাম, সেকেলে নাকি এক বামুন,—কি এক পশুরাম না জন্তুরাম তার নাম,—বাপের কথায় তার আপনার মাকে হত্যা করেছিল। সেই পশুরাম ব্যাটা এম্নি পাষণ্ড,—বাপ বল্লে, আর যে-মায়ের পেটে জন্মেছে সেই মায়ের গলাটি কুড়ুল দিয়ে—ঘ্যাচ্। পড়ে আমার এম্নি রাগ হয়েছিল যে—"

পুত্রকে বাধা দিয়া, কৃত্রিম শঙ্কা প্রকাশপূর্ব্বক চক্ষু কপালে তুলিয়া, যশোমতী বলিয়া উঠিলেন—

"ওরে বাবা, রক্ষে কর! তুই কি আমার গলা কাটবি নাকি রে? চোখ মুখ তোর যে রকমটা লাল হয়েচে, তাইতে মনে হচ্চে যেন আমার গর্দ্দান নেবার জন্যেই তুই এখানে এসেচিস"।

বুদ্ধিমান কাবুলচন্দ্র জননীর ভীতত্রস্ত ভাবের কৃত্রিমতাটুকু ধরিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্তে বলিয়া উঠিল—

সাহিত্য-জমিদার

"ধুত্তর, তোমাকে কিছু করার কথা হচ্চে যেন! তোমার গায় হাত তোলবার আগে কাবুলচন্দ্রের ঘাড়েই কুড়ুলের তিন কোপ—ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্—করে বসিয়ে দেব না? বলছিলাম কি, ঐ পশুরাম ব্যাটা,—কোথাকার জঙ্গলীভূত,—বাপের কথায় মাকে মেরে বড্ড পিতৃভক্তি দেখিয়েছিল। আমি দেখাতে চাই, আমি আমার মাকে কেমন ভালোবাসি, ভক্তি করি। আমি হব মাতৃভক্ত কাবুলরাম। তোমার গায় যে অমন করে বেত মারতে পারে, সে অতি জঘন্য রকমের বাবা! তুমি যা হুকুম কর ত বুড়োকে ঘা-কতক দিয়ে তোমার হাতে পিঠে কালশিরে পড়িয়ে দেওয়ার সুখটা টের পাইয়ে দি"।—বক্তব্য শেষ করিয়া মাতৃভক্ত পুত্রটি, যেন আদেশের অপেক্ষায়, উৎসুকনেত্রে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল।

অন্য কোনো পুত্রের মুখে এই প্রকার অসম্ভব কথা শ্রবণ করিলে যশোমতী নিশ্চয়ই সাতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইতেন। কিন্তু এই অপরিপক্কমস্তিষ্ক গোবরগণেশ পুত্রটির কোনো কথায়ই তিনি ক্রোধ করিতে পারিতেন না। সে যে তাঁহারই রক্তমাংসে গঠিত, তাঁহারই দোষগুণের জীবন্ত প্রতিকৃতি। এমন ছেলের উপর তিনি কোন প্রাণে রাগ করিবেন?

তথাপি, দোষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে উহা "চোখে আঙ্গুল" দিয়া দেখাইয়া না দিলে পুত্রের হিতাহিত

জ্ঞান জন্মিবে না ইহা মনে করিয়া তিনি তিরস্কারের সুরে বলিলেন—

"কি বল্লি, কি বল্লি মুখ-পোড়া ছেলে? ওকথা আবার বলে, মুখেও আনতে হয়? ছি ছি ছি! হাঁ রে কাব্‌লে, দিন দিন বড় হচ্চিস্, এখনও তোর একরত্তি বুদ্ধিশুদ্ধি হলো না? ফের যদি ওরকম কথা আমার সামনে বলবি, তবে তোর সঙ্গে আমি আর কথাই কব না"।

তাড়া খাইয়া কাবুলচন্দ্র যেন আকাশ হইতে পড়িল! কী যে তাহার অপরাধ, অন্যায় যে সে কোথায় করিল, কখন করিল, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে বলিল—

"কি হলো আবার? কি করেচি, কি বলেচি আমি যে তুমি আমায় বকচো মা? আজ যেন তোমরা সবাই কাবুলের ওপর এক্কেবারে মারমুখো হয়ে রয়েচ। ছুতো একটুকু পেলে কি,—অম্নি দে পিটুনি,—লাগাও বকুনি! দরকার নেই বাবা আমার এমন বাড়িতে থেকে। তোমাদের দুটো খাই পরি, হাবুলদা'র মত রোজকার করিনে,—এই ত আমার অপরাধ? থাক তবে; অপরাধ আর বাড়াবো না।—চাই একটি লোটা, একটি কম্বল, আর একখানা চিমটে। কম্বল ত আমার একখানা আছেই। চারটে পয়সা হলে চিম্‌টেও একখানা কেনা যায়। বাকী রইল একটি ঘটি। তা, ঘটি তুমি একটি দিতে পার ত

বহুত আচ্ছা। না পার, সেজন্য আমার কিছুমাত্র আটকাবে না। কালই আমি যেখানে দু' চোখ যায় চলে যাবো"।

গৃহত্যাগ করিবার ভীতিপ্রদর্শন কাবুলচন্দ্রের এই প্রথম নহে। প্রকৃতপক্ষে, যতবারই তাহার পৃষ্ঠে উত্তমমধ্যম যথোপযুক্তরূপে বর্ষিত হইয়াছে, ততবারই সে জননীর নিকট গিয়া আপনার সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার দারুণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু, দেখ বিধাতার কারসাজি, সেই ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুবুদ্ধিটুকু তিনি কখনই কাবুলচন্দ্রের ঘটে প্রেরণ করিলেন না। এই হবু-সন্ন্যাসীটির লম্ফঝম্প যে সমস্তই মূর্খের বাহিক বাগাড়ম্বর মাত্র ইহা বহুদিন পূর্ব্বেই যশোমতী জলের ন্যায় পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং পুত্রের বাক্যে এতটুকু মাত্র বিচলিত না হইয়া, পূর্ব্বের মতই তিরস্কারের সুরে, তিনি বলিলেন—

"যাস্ যাবি বাপু। 'সন্ন্যাসী হব, সন্ন্যাসী হব, সন্ন্যাসী হব'; শুনে শুনে কাণ আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। হতে ত দেখলুম না একবারও। সন্ন্যাসী হয়ে দ্যাখ্ না একবার মজাটা। খিদে যখন পাবে, কিচ্ছুটি আর খেতে পাবে না। গাছতলায় বসে তখন হাপুস নয়নে কাঁদবে, আর ভাববে, কেন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলুম"।

কথা শেষ করিয়া যশোমতী ফিরিয়া বঁটিতে গিয়া বসিলেন

এবং আগেকার মত আলু পটোল ছাড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর এক সময় মুখ তুলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন কাবুলচন্দ্র পাংশু মুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখ দিয়া যেন তার আগুনের হল্‌কা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দেখিয়া তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—

"ইস্, কি আমার লাটসায়েব এসেচেন! বুড়ো ছেলে, বার বার এগ্‌জামিন ফেল হচ্চেন,—তা কেউ তাকে কিচ্ছুটি বলতে পাবে না! উল্টে আবার গুরু-জনের গায় হাত তোলা! অত কি বাপু? ইচ্ছে হয়ে থাকে, সন্ন্যাসী হোক, বৈরাগী-বাউল হোক, কি মুস্কিল-আসান হোক,—যা হয় একটা কিছু হয়ে ছ্যাথ্ না। ভারি সুখ কিনা! তিন দিনের ভেতর সুড়্‌সুড় করে যদি বাড়ি না ফিরতে হয় তবে কী আর বলেচি আমি। যতক্ষণ পেটের খিদে সইতে পারবে, ততক্ষণই তোমার ঐ সন্ন্যাসী-গিরি ফলানো ' যেই খিদেটি পাবে, অম্নি 'ঘরমুখো বাঙ্গালী'। দেখে নিও তখন"।

ঘাড় কাত করিয়া, চোখ মুখ বিকৃত করিয়া, নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে কাবুলচন্দ্র উত্তর করিল—

ওহো, কি কথাই বল্লেন! তোমার বুদ্ধি দেখে মজন্তালি সরকারের মত পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে মরি আর কি! সন্ন্যাসীদের আবার খিদে, তাদের আবার তেষ্টা। জঙ্গলী-বিবির

টিলার ওপর হত্তুকি গাছের বন। সেখানে খুঁজেপেতে একটাও কি আর পাকা হত্তুকি পাবো না মনে করেচ? নিশ্চয়ই পাবো। যাঁহাতক পাওয়া, আর টপ্ করে খাওয়া। পাকা হত্তুকি একবার পেটে গিয়েচে কি, আর কস্মিন কালে না খিদে, না তেষ্টা! বাস, একেবারে নির্ব্বিকার পরংব্রহ্ম! বয়েই গেছে খিদের চোটে তোমার কাছে পালিয়ে আসবার জন্যে। আমি এম্নি গোমূর্খ কিনা যে সব অন্ধিসন্ধি না জেনেই তড়্বড়্ করে একটা কাজ করে বসবো"!

পুত্রের কথায় যশোমতী মনে মনে হাসিলেন। এ কেমন ছেলে? এক ভাগ নিরেট, আর তিন ভাগ ফাঁপা! এত কথাও বলিতে পারে মানুষে? পটোলের ভিতর হইতে সাবধানে বিচিগুলি বাছিয়া ফেলিতে ফেলিতে তিনি প্রশ্ন করিলেন—

"যদি পাকা হত্তুকি না পাস্ একটাও, তা হলে কি উপায় হবে"?

"না পাই, তাতে আর কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? পাকা হত্তুকি না পাই, কাঁচা হত্তুকির ত আর কিছু কমি নেই সেখানে। পাকা খেলে যদি জীবনে খিদে না পায়, কাঁচা হত্তুকি খেলে জন্মের মত না হোক, পাঁচ সাত বছর কোন্ আর না খেয়ে কাটানো যাবে। খুব যাবে। আর যদি ধর কপাল গুণে তাও

না জুটল, তাতেই বা আর কোন ভূতের বাপের ছেরাদ্দ নষ্ট হচ্ছে ? দিব্বি গাছতলায় কম্বলখানা বিছিয়ে বসা যাবে। একদিকে থাকবে লোটা, চিম্‌টেটা আর একদিকে মাটিতে পোতা থাকবে,— সামনে জ্বলবে ধুনী। পরমহংস দেখে মানুষে ভক্তি করে খাবার জিনিষ কিছু না কিছু দেবেই। দেখে নিও তুমি। ইঃ, খিদের চোটে তোমার কাছে পালিয়ে আসতে গেলাম আর কি! আসি যদি পালিয়ে, ঐ বঁটি দিয়ে তুমি আমার নাক কেটে দিও"।

জননীকে এইবার হাসিয়া ফেলিতে হইল। হাতের পটোলটি বঁটির পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি বলিলেন—

"থাক, থাক, ঢের হয়েচে। নাককাটা হয়ে আর কাজ নেই।—সে দিনকাল আর নেই রে কাবুল, যে সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই মানুষ ঢিপ্ করে পেন্নাম করবে, কি টাকা পয়সা, সেবার জন্য ভাল ভাল সামগ্রী, সব সামনে রেখে দিয়ে যাবে। সাধু-ফকির দেখলে এখন মানুষে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। মনে করে— এ ব্যাটা খুনী কি জোচ্চোর। সন্ন্যাসী সেজে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে"!

খবর বটে একটা। আধুনিক মনুষ্যদেরও তাহার পিতার ন্যায় যষ্টিহস্তে গৃহত্যাগী নিরীহ সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করিবার

বদভ্যাস জন্মিয়াছে শুনিয়া কাবুলচন্দ্র কিয়ৎকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি গোঁয়ার-গোবিন্দদের বিধাতা অন্য যে কোনো গুণ দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকুন না কেন, তর্ক করিবার ক্ষমতাটা যেন তিনি খেসারৎ হিসাবে ষোলো আনার উপরে আঠারো আনাই তাহাদের দিয়াছেন। সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্য দমিলেও, ক্ষণিকের মৌনভাব দূর করিয়া, যেন জননীকে কথায় বড় আঁটিয়া উঠিতে পারিয়াছে এই গৌরবে, কাবুল সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—

"আচ্ছা, আচ্ছা, তবে না হয় সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী না-ই হওয়া যাবে। তা'তেই বা আর কি? আর একটা জিনিষ ত করতে পারব খুব সহজে। তা'তে ত আর কেউ লাঠি মারতে আস্‌বে না"?

"কি জিনিষ রে"?

"হ্যাঁ, তোমাকে বলি, আর তুমি গিয়ে এক্ষুণি বাবার কাণে ফুস্-মন্তর ঝাড়। কক্ষনো বলবো না, কিছুতেই বলবো না।— ঠিক, ঠিক, ঠিক হয়েচে। এইটেই করতে হবে। সন্ন্যাসী হওয়া টওয়া গর্দ্দভের কর্ম্ম! এইটেই বেশ হবে, সুন্দর হবে"। বলিয়া, কাবুলচন্দ্র সবেগে মস্তক সঞ্চালিত করিতে লাগিল।

তাহার রকম-সকম দেখিয়া যশোমতী অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া বলিলেন—

"না বল্লে আর কি হবে? আমি বুঝতে পেরেচি তোর মতলবখানা। বলবো?—বলি?—তুই মনে করেচিস্, আমার বাক্স ভেঙ্গে, টাকাকড়ি কিছু হাতড়ে, সটকান দিবি,—এই ত?

কাবুলের জননী অবশ্য কখনই ইহা মনে করেন নাই। বরং তিনি জানিতেন কাবুলচন্দ্র গোঁয়ারই হউক, আর অল্পবুদ্ধিই হউক, অসৎ কখনই নহে। কেবলমাত্র পুত্রের মনে ক্রোধ জন্মাইয়া তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিবার জন্যই তাঁহার এই চাতুরীর আশ্রয় লওয়া। বুদ্ধিমান কাবুল ভাল মন্দ কিছুই না বুঝিয়া সহজেই ফাঁদে পা দিয়া বসিল। উৎকট মৃগীরোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সে উত্তর দিয়া ফেলিল—

"দূর, দূর, তা কেন? আমি চোর কিনা যে তোমার বাক্স ভাঙ্গতে যাবো। শুনবে তবে?—লবণে যাবো গো, লবণে যাবো"।

কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া যশোমতী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"এই ত বল্লিরে, বোকা। বলেচি না, রাগ যদি হলো, তবে এদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব শিকেয় উঠল।—উঁহুঃ, বলবো না, বলবো না; —এখন যে বড় বল্লি"?

মুখ কাচুমাচু করিয়া কাবুলচন্দ্র উত্তর দেয়—

"না বলে আর করি কি, বল ? তুমি যে নিতান্ত বোকার মত যা তা ঠাওরাতে লাগলে। যাক্, বলে ফেলেচি ত ফেলেচি। তুমি কিন্তু মা বাবার কাছে এসব কথা আবার লাগাতে যেও না। যাবে না, বল"।

যশোমতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"আচ্ছা, আচ্ছা, কিচ্ছু বলবো না আমি তাঁকে। আগে বল, লবণে যাওয়া কা'কে বলে"।

"ও রাধাকেষ্ট! তাও জানোনা বুঝি? তবে কি আর জানো ছাই" বলিয়া, কাবুলচন্দ্র মহোল্লাসে 'লবণে যাওয়া' ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল।—"আরে, গান্ধী যে লবণ-আইন ভঙ্গ করতে বলেচে, শোননি? হাঙ্গাম-হুজ্জুত কিছু নেই এতে।— বাড়ি থেকে পালাও; কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখাও; একটা হাঁড়ি যোগাড় কর; তাতে লোনা জল ভর,—আর আগুনে চড়িয়ে দাও। চট্‌পট্ জল শুকিয়ে নুন বেরুবে, আর পট্‌পট্ লবণ-আইন ভঙ্গ করা হবে। বাস্, সবাই বলবে—দেশকর্ম্মী!! এই হলো গিয়ে তোমার 'লবণে যাওয়া'। খোরাক, পোষাক, মাথা গোঁজবার জায়গা—সব কংগ্রেস যোগাবে। তোমার না চিন্তা, না ভাবনা। কী চমৎকার! এইটেই করা যাবে শেষ পর্য্যন্ত। মায়ের বকুনি খাওয়াও নেই, বাপের লাঠি খাওয়াও নেই। আচ্ছা জব্দ হবে তোমরা"।

"আর তুই বুঝি জব্দ হবিনে মনে করেচিস্? বাবার লাঠি খাওয়া নেই সত্যি; কিন্তু পুলিশের লাঠি ত রয়েচে। এ তোর বাবার সরু বেতগাছা নয় রে কাবুল। দেখেচিসত পুলিশের লাঠি এক একখানা? কী লম্বা, আর কী মোটা! ওর এক ঘা পিঠে পড়লে কি আর রক্ষে আছে?—এই ত সেদিন তোর ছোট-মামা বলছিল যে পুলিশ কোথায় লবণওয়ালাদের এমন লাঠিপেটা করেচে যে সব এখন হাঁসপাতালে ভুগ্‌চে। কারো হাত ভেঙ্গেচে, কারো ভেঙ্গেচে ঠ্যাং, কারো মাথাই দু' ফাঁক! ভারি মজা! যাবি লবণে"?

কাবুলচন্দ্র নতমস্তকে ভাবিতে সুরু করিয়া দিল। বিষম সমস্যাই বটে! এ-যে একেবারে "জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ!" বেচারা এখন যায় কোন দিকে? পিতার তথাকথিত নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার দুইটি সুন্দর পন্থা সে মনে মনে বেশ পাকাপোক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। একটি, সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করা, আর একটি, লবণে যাওয়া। কিন্তু এই দুই পথেই যে নানাপ্রকার বিভীষিকা অভ্রভেদী হিমাচলের মত তাহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইবে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এখন জননীর নিকট উহাদের স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাহার মানসিক অবস্থা কি প্রকার হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। বহু চিন্তা ভাবনার পর সে বলিল—

"যেতে কি আর চাই আমি কোথাও? তবে, তোমরা যদি আমাকে এমন করে বাড়িছাড়া কর, তবে না গিয়েই বা আমি করি কি, বল ত?—সকাল থেকে একজন দমাদ্দম মার দিচ্চেন; আর একজন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাচ্চেন। কাঁহাতক আর সওয়া যায়? রক্ত-মাংসের শরীর নয় আমার"? বলিয়া, কাবুলচন্দ্র সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। দেখিতে দেখিতে নিজকে একটু সামলাইয়া লইয়া, পুনরায় সে আপনার অভিযোগগুলি বলিয়া যাইতে লাগিল।—

"রাত নেই, দিন নেই, খালি বকুনি—আর বকুনি। একজন আছেন, আমার পেছনেই সর্ব্বক্ষণ লেগে। পান থেকে চুণটুকু খসেচে কি এলেন অমি লাঠি নিয়ে দৌড়ে। এত বড়টি হয়েচি,—ধাড়ী ছেলে, কিন্তু পিটুনির বেলায় যেন পাঁঠা, কি ছাগল, কি গাধা! বেরিয়ে ত যাবোই। দেখি কে আমাকে আটকাতে পারে। এখানেই বা আর কোন সুখে আছি? ঘরেও পচা কুমড়োর মত লাথি আর ঝাঁটা, বাইরেও না হয় তা-ই হবে"। বলিয়া, কাবুল বসন প্রান্তে নেত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

ব্যাপার অনেক দূর গড়াইল দেখিয়া যশোমতীকে পুনরায় বঁটি ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িতে হইল। পুত্রের নিকটে আসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চোখ মুখ মুছাইতে মুছাইতে তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—

"ছিঃ কাবুল, বুদ্ধি-আক্কেল তোর আর কবে হবে? নে, কাঁদিসনে বাপ। একটু শান্ত হ দেখি। আচ্ছা, তুই যে অত দুঃখ করছিস, একবার ভেবে দেখ দিকি অবস্থাটা! ওঁর ত পেন্‌সনের সময় হয়ে এল। আর, ক'টা টাকাই বা পেন্‌সন হবে! বড় জোর পঁচানব্বুই, কি একশো! তখন এই এত বড় সংসারটা কি করে চলবে, ভেবে দেখেছিস? নিতান্ত ছোট ত আর ন'স; সব রকম চিন্তা-ভাবনাই একটু একটু করতে হয়। উনি চান, হাবুলের মত তুইও লেখাপড়া শিখে মানুষ হ। রোজকার পত্তর করে নিজের পায় নিজে দাঁড়াতে শেখ। তবেই ত উনি বুড়ো বয়সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবেন"।

পূর্ব্ববৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কাবুলচন্দ্র উত্তর করিল—

"মিথ্যে কেন তোমরা আমাকে পড়াচ্ছ, মা? লেখাপড়া আমার আর হবে না। বার বার ফেল হচ্চি, তবুও এ কথাটা তোমরা বোঝ না কেন? ঐ যে বলে না—

কপালে নেইক ঘি
ঠকঠকালে হবে কি?

এ হয়েচে তাই। আমাদ্বারা ওসব পাস টাস করা হবে না। খামকা তোমাদের বকাঝকা, অনর্থক তোমাদের মারপিট"।

যশোমতী বলিলেন,—"মাঝে মাঝে তুই যে রকম বুদ্ধিমানের মত কথা বলিস কাবুল, তাতে পরীক্ষাটা তুই পাস করতে পারবিনে একথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।—আর, আমি একটু বকলুম, কি উনি একটু মারলেন, তাইতেই রেগে মেগে একেবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া,—সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ, না নির্ব্বোধের কাজ, বল ত? এ সবই তোর ভালোর জন্যে। মনে করবি, এ সমস্ত বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদ। উনি মাঝে মাঝে আমায় কি বলেন, জানিস? বলেন, "রাগের মাথায় কাবুলকে এক এক দিন খুব শাসন করি বটে, কিন্তু যে দিনই ওকে মেরেচি, সে দিনই রাতে আর চোখ বুজতে পারিনি। সমস্ত রাত ওর শুক্‌, মিনতিভরা মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে। মনে হয় ও যেন বলচে, 'বাবা, বাবা, আমাকে আর মেরো না, আর মেরো না আমাকে। আমি এখন থেকে ভালো হব'। তখন মনে হয় যত গুলো আঘাত ওকে করেচি, সব পড়েচে আমার নিজের বুকে। যন্ত্রণায় তখন চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে যায়। সারা রাত এপাশ ওপাশ করে করে শেষে দেখি রাত ফর্সা হয়ে গেল। দেখেচিস্, এই ত বাপ মায়ের প্রাণ! আর তুই কিনা— যাক্ সে সব কথা। আমি আজও তোকে বলচি কাবুল, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, যাতে আসচে বার পাস হতে পারিস। ওঁর ত আর জমিদারী নেই, কি ব্যাঙ্কে মেলা টাকাও

নেই, যে লেখাপড়া না শিখে, কাজ কর্ম্ম না করে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে"।

জননীর শেষ কথা গুলি কাণে যাইতেই কাবুলচন্দ্র বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিয়া উঠিল—

"বাবার জমিদারী না থাকতে পারে, আমার ত আছে। আর ক'টা দিন সবুর কর মা, দেখে নিও তখন কি হতে পারি আমি। তোমরা সবাই মনে কর, কাবলেটা একেবারেই অপদার্থ। কিন্তু আমি যে ভেতরে ভেতরে কি করচি সে খবর ত আর তোমরা রাখো না। যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে, তখন তোমরা ভাববে, তাই ত, এমন সোনারচাঁদ ছেলে, চুপি চুপি এত কীর্ত্তি করে বসে আছে, আর আমরা ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেলাম না! উল্টে আরো কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত উৎপীড়ন ওকে করা গেছে। দেখে নিও তখন, এই কাবুলচন্দ্র হতে, শুধু তোমাদের নয় মা, তোমাদের সাত কুলের মুখ উজ্জল—ঝলমল। আর, ঐ যে উনি এখন যখন তখনই লাঠি উচিয়ে তেড়ে আসচেন, উনিই তখন উপযুক্ত ছেলের পেছন পেছন ছুটবেন আর বলবেন—'হাঁ বাবা কাবুল, এটা?—হুঁ বাবা কাবুল, ওটা,? বুঝবে তখন কাবুল চন্দ্রের কদর। একেবারে জমিদার মা, একেবারে জ— মি—দা—র" !!

পুত্রের অসাধারণ বাক্যচ্ছটায় যশোমতীর বিস্ময়ের পরিসীমা

রহিল না। এ কি কাণ্ড! যে কাবুলচন্দ্রকে তিনি নিতান্ত স্বল্পভাষী, মুখচোরা বলিয়া জানিতেন, যাহার একসঙ্গে দশটি কথা বলিতে ঘাম ছুটিয়া যাইত, সেই কাবুলচন্দ্রের আজ সহসা একি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! কোন দুষ্ট সরস্বতীর কৃপাকটাক্ষে পুত্রটি তাঁর রাতারাতি এমন মুখফোর হইয়া উঠিল? তাঁহার সন্দেহ হইল যে, হয় ত বুদ্ধিমান পুত্রটি আবার কোনো মূর্খোচিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, এবং উহারই ভাবি ফল সম্বন্ধে অতি মাত্রায় আশান্বিত হওয়ার দরুণ তাহার এই মহোল্লাস।

হঠাৎ একটা কিছু অনুমান করিয়া উহার যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাস্যমুখে তিনি বলিলেন—

"ওঃ হো, আবার বুঝি কোনো লটারীর টিকেট কেনা হয়েচে? প্রথম পুরস্কারই বুঝি বর্দ্ধমানের জমিদারী? পেয়েচিস নাকি তুই সেটা"?

জননীর বাক্যে বিদ্রূপের গন্ধ পাইয়া কাবুলচন্দ্র তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—

"আরে দূর, দুর; লটারী-ফটারী আবার ভদ্রলোকে খেলে! ছাইয়ের কথা যত! তোমরা খালি জানো চিমটি কেটে কথা বলতে। আহা, কি ঠাট্টাই হলো! কিন্তু দেশময় যখন জমিদার বলে আমার নাম ফেটে পড়বে, তখন অত ঠাট্টা-মস্করা তোমার থাকবে না, বলে দিচ্ছি। আর মাসখানেক সবুর কর

মা, তখন দেখতে পাবে এটা তোমার বর্দ্ধমানের জমিদারী, কি—

কথাটা কাবুলের মুখে আটকাইয়া গেল। অতিমাত্রায় বিবর্ণ হইয়া গিয়া সে শুনিতে পাইল উপরের তলায় চটি পায় দিয়া কেহ সশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই যেন হড়্হড়্ করিয়া চেয়ার ঠেলিয়া দিবার মত একটা রূঢ় শব্দ পিস্তলের গুলীর মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণে আঘাত করিল। কাবুলচন্দ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল এবং মুহুর্মুহু খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সহসা একটা গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ শব্দ শুনিয়া যখন সে বুঝিতে পারিল উপরতলার চটিধারী ব্যক্তিটি কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় একতলায় নামিবার সিঁড়ির দিকে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়াছে, তখন অবশ্য স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে তাহার এতটুকু সময় লাগিল না।

বিস্মিতা যশোমতী দেখিতে পাইলেন কাবুলচন্দ্র একটু পশ্চাতে হটিয়া গিয়া, হাত-পা গুটাইয়া, মুখ ব্যাদান করিয়া, সম্মুখের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া পড়িল। পরক্ষণেই হুপ্ করিয়া একটা শব্দ,— আর তিনি দেখিলেন, তাঁহার নন্দনটী এক লম্ফে দরজার ভিতর দিয়া গলিয়া একেবারে বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। চটিজোড়া তখন ভীমবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে, "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মঞ্জুবাণী পণ্ডিত-

মূর্খ সকলের নিকটই সুবিদিত। আর কাবুলচন্দ্রের নিকট ত উহার তাৎপর্য্য একেবারে অস্থিমজ্জাগত। সুতরাং সে এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করিবে কেন? চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে কাবুলচন্দ্র লগুড়াহত কুক্কুরের ন্যায় বারান্দা হইতে সদর-দরজার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

ওদিকে পদশব্দে বাড়িঘর প্রকম্পিত করিয়া, দেখিতে দেখিতে সুবলচন্দ্র বেত্রহস্তে ভাণ্ডার-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখ হইতে কোনো বাক্য নিঃসৃত হইল না। অতিরিক্ত ক্রোধ বশতঃ দ্বিতল হইতে একতলায় যেন এক প্রকার উড়িয়া আসিবার জন্য তিনি আপনাকে এত অধিক বেগবান করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, উহার ফল স্বরূপ, গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া, তাঁহার আর দম রহিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

যশোমতী শাসনকার্য্যে স্বামীর অত্যধিক বাড়াবাড়ি দেখিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই ছিলেন। এইবার তাঁহাকে হাঁপাইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"বেশ ত পড়ছিলে ওপরে; আবার নীচে নেমে এলে কি বলে? অত দস্তিদানোর মত হুড়মুড়িয়ে আসতেই বা বল্লে কে, আর এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করতেই বা কে বল্লে, শুনি"?

সুবল বাবুর ততক্ষণে একটু দম ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি স্ত্রীর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া বেত্র আস্ফালন পূর্ব্বক বলিলেন—

"গুয়োটা গেলো কোথায়, বল দিকি? সেই যে এক ঘণ্টা থেকে কি বকর বকর সুরু করেচে, কার সাধ্য ঘরে টিকে থাকতে পারে। মনে করেছিলাম, এই সকালবেলায়ই কতকগুলো মার খেয়েচে, আর কিচ্ছুটী বলবো না; করুকগে বকর বকর। কিন্তু বাপরে, কাণের পোকা যদি বের না করে থাকে, তবে কি আর বলেচি; ছেলে নয়ত, একখানি রত্ন! হাড়ে মাসে জ্বালিয়ে খেলে। বাক্যের জাহাজ! ওদিকে দেখ বছর বছর পরীক্ষায় ফেল হচ্চেন। ফর্‌ফরি দাস গেলো কোন্ দিকে বল দিকি"?

গৃহিণীর বিরক্তি বুঝি এইবার ক্রোধে পরিণত হইল। ভ্রূকুটি করিয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে তিনি বলিলেন—

"যে দিকেই যাক, তোমার তাতে কি? দরকার থাকে, তুমি খুঁজে নাওগে। একি সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বাপু! আপনার ঘর-দোরে ছেলেপুলেরা থাকবে না?—মায়ের সঙ্গে কথা বলবে না? তা'হলে ওরা যাবে কোথা? আর, সব সময়ই তুমি কেন লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসবে? অত মারধর করলে ছেলেদের ভয় ভেঙ্গে যায়। তখন হাজার মারো, হাজার ধরো,—কিছুতেই আর ওদের

গ্রাহ্য থাকে না। আমার মনে হয়, এই এগ্নিধারা পিটিয়ে পিটিয়েই তুমি কাব্‌লের মাথাটী খেয়ে বসে আছ।"

তিক্তকণ্ঠে সুবল বাবু উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, তা' বলবে বৈ কি। খাবার জিনিষের ত একেবারে আকাল পড়ে গেছে কিনা, যে নিজের ছেলের মস্তকটি আমার না খেলেই আর চলছিল না। ভ্যালা বিপদেই পড়া গেছে! নিজেও ছেলেকে কিচ্ছুটী বলবেন না, আমাকেও বলতে দেবেন না। ঐ রকম আদর দিয়ে দিয়েই ছোঁড়াটার মাথা চিবুলে তুমি" বলিয়া, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে তিনি পুনরায় উপরে চলিয়া গেলেন।

সেই দিবস রাত্রে।

সুবল বাবু রাত্রির আহার সচরাচর আটটা ন'টার মধ্যেই সমাধা করিতেন। কিন্তু কোনো কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হওয়ায় সেদিন তাঁহার আহারে বসিতে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল।

যশোমতী ষ্টোভে গরম গরম লুচি ভাজিয়া স্বামীর থালায় পরিবেশন করিতেছিলেন, আর সুবল বাবু প্রসন্নচিত্তে সেই ঘৃতপক্ক তপ্ত লুচিগুচ্ছ আলুপটোলের ছক্কা সহযোগে অতি তৎপরতার সহিত যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

এক সময়ে পাঁচ সাতখানা লুচি এক সঙ্গে কর্তা মহাশয়ের পাতে ঢালিয়া দিয়া, ষ্টোভ নিভাইয়া, যশোমতী তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন। একথা সেকথা বলিতে বলিতে গৃহিণী লক্ষ্য করিলেন যে, স্বামীর মুখখানা যেন অতি মাত্রায় হাস্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এতাদৃশ অস্বাভাবিক প্রফুল্লতার কোনই হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া কৌতুহলের বশীভূত হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"—কি হয়েচে গা? ইস্, হাসি দেখচি তোমার মুখচোখ বেয়ে পড়চে! ব্যাপার কি"?

সুবলবাবু বোধ করি এতক্ষণ কষ্টেস্বষ্টে উত্থিত হাস্যবেগ দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী উস্‌কাইয়া দিতেই তিনি একেবারে হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাস্যের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি বলিলেন—

"ব্যাপার আর কি?—ব্যাপার আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ডু! কিন্তু তবু সুখবর বলতে হবে বই কি! সার্থক যশো তোমার কাবুলচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করা।"

"কি হয়েচে ছাই বলোই না। কি করেচে কাবুল? কি হয়েচে তার"?

এক টুকরা আলু মুখে ফেলিয়া দিয়া সুবলচন্দ্র উত্তর করিলেন—

"বিশেষ চিন্তা ভাবনা করবার মত অবশ্য কিছুই হয়নি।

বলতে যাচ্ছিলাম কি যে ছেলে তোমার শীগগিরই জমিদার হচ্চেন। অদৃষ্টে থাকলে, চাই কি ভবিষ্যতে রাজা, কি তারও ওপরে সম্রাটও হয়ে যেতে পারেন। জয় জয় কাবুলচন্দ্রের জয়! ধন্য ধন্য তুমি হে যশোমতী, আর শতধন্য তোমার ছেলে" !!

কাবুলচন্দ্রের জননী এইবার বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"নাও, নাও, তামাসা রাখো। কি হয়েচে বলতে হয় বল, না বলতে হয় মুখটি বুজে খেয়ে ওঠো। রাত কিছু কম হয়নি"।

"ওঃ, তা' বটে। সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না। শুনবে তবে? শোন" বলিয়া, সুবল বাবু গ্লাস তুলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া পাঁচ সাত ঢোক জল পান পূর্ব্বক, কণ্ঠটি লুচি আলু পটোলের কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া, বলিতে লাগিলেন—

'গর্দ্দভচন্দ্র পড়েচে এক জোচ্চোরের পাল্লায়!—বিকেল বেলা একখানা চিঠি লিখতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর ফাউণ্টেন পেনটী নেই। খোঁজে খোঁজে গেলাম কাবুল বাবুর ঘরে। আধ ঘণ্টা পাক্কা সমস্ত জিনিষপত্তর তছ্‌নছ্‌ করে শেষে দেখি ওর দেরাজের ভেতর, এক গাদা কাগজের নীচে, কলের কলমটী বিশ্রাম করচেন। কলমটী তুলে নিতেই দৃষ্টি পড়ল একখানা আনকোরা এনভেলাপের ওপর। কি মনে হলো, সমস্ত কাগজপত্র খামের ভেতর থেকে টেনে বার করলাম। তারপর, সে গুলো পড়ে ত আমার চক্ষু স্থির!—কলকাতার কোন "দিব্যদৃষ্টি

প্রদায়িনী” কাগজের সম্পাদক তোমার পুত্ররত্নের কাছে চিঠি লিখেচেন। দাঁড়াও, চিঠিখানা আমার পকেটেই আছে ; তোমাকে পড়ে’ শোনালেই তুমি সব বুঝতে পারবে”।

কথা শেষ করিয়া সুবলবাবু আহার স্থগিত রাখিলেন এবং বামহস্তে পকেট হইতে এক খানা এনভেলাপ টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার পর কৌশলে উহার ভিতর হইতে এক খানা পত্র বাহির করিয়া বলিলেন—“মন দিয়ে শোনো”।

পত্রপাঠ চলিল—

শ্রীযুক্ত কাবুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

বরাবরেষু—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

লিখিতং পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার অনুগ্রহলিপি ও তৎসহ মহাশয়ের রচনাগুলি পাইয়া যৎপরোনাস্তি বাধিত ও কৃতকৃতার্থ হইলাম।

আপনি “সাহিত্য-সম্রাট” উপাধি লাভ করিবার নিয়মাবলি জানিতে চাহিয়াছেন। তদনুসারে আপনাকে জানান যাইতেছে যে “সাহিত্য-সম্রাট” উপাধির জন্য ২০০৲ শত, “সাহিত্য-রাজ” উপাধির জন্য ১০০৲ শত, এবং “সাহিত্য-জমিদার” উপাধির জন্য ৫০৲ টাকা দক্ষিণা আমাদের পরিষৎ কর্ত্তৃক ধার্য্য আছে। লেখা

আমাদের রুচি অনুসারে সুন্দর হইলেই হইল। উল্লিখিত উপাধিগুলি পাইতে হইলে এম-এ, বি-এ, হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আপনার ন্যায় বিদ্বান বহু ব্যক্তিকে আমরা উল্লিখিত উপাধিগুলিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছি।

আপনার লেখাগুলি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি; এবং আমাদের পরিষদের যাবতীয় অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদেরও পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। আপনার লেখা সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে, সে সমুদয় এখনও "সাহিত্য-সম্রাট" উপাধির যোগ্য হয় নাই। তথাপি রচনার ভঙ্গি দেখিয়া আমরা সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠে এবং অতি নিরাপদে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে শীঘ্রই সেই প্রকার হইবে।

দক্ষিণার টাকা সর্ব্বদা অগ্রিম দেয় বিধায়, মনি-অর্ডার যোগে ৫০৲ টাকা (Rupees Fifty only.) সত্বর পাঠাইয়া দিলে, আমরা আপনার প্রেরিত লেখাগুলি প্রকাশিত করিয়া সম্প্রতি আপনাকে "সাহিত্য-জমিদার" উপাধিমণ্ডিত করিব।

টাকা হস্তগত হইবার পর হইতেই কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ আপনাকে "সাহিত্য-জমিদার কাবুলচন্দ্র" বলিয়া অভিনন্দিত করিবে।

আপনার অধুনা-প্রেরিত সমস্ত লেখাগুলি প্রকাশিত হইলে,

সে সমুদয় একত্র বাঁধাইয়া আমরা "সাহিত্য-জমিদার কাবুলচন্দ্রের গ্রন্থাবলী" নামে বাজারে বাহির করিব।

আমাদের সরল উপদেশ আপনি এখন কবিতা লিখিবেন না। যদিও আপনার "তেঁতুল" কবিতাটি সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত হইয়াছে, তথাপি উহা অত্র সঙ্গে ফেরত দিতে বাধ্য হইলাম।

পত্রপাঠ লো পোক্তা মবলগ ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অলমিতি—

একান্ত বিনয়াবনতমস্তক

শ্রীবলহরি বল।

'দিব্যদৃষ্টি প্রদায়িনী' সম্পাদক।

পুনশ্চ : টাকা প্রাপ্তিমাত্র উৎকৃষ্ট বহু মূল্যবান এন্টিক ভেলামে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আমাদের 'সাহিত্য-জমিদার' উপাধির সনদ আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। ভিঃ পিঃ তে কদাচ পাঠান হয় না।

সম্পাদক

পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া সুবলচন্দ্র হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পুত্রের নির্ব্বুদ্ধিতায় যশোমতীও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

হাসি থামাইয়া সুবলবাবু বলিলেন—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখনই

হেসে ঢলে পড়লে চলবে কেন? আগে শ্রীমানের "তেঁতুল" কবিতাটি শোনোই, তারপর যত খুসী হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করো" বলিয়া, তিনি এনভেলাপের ভিতর হইতে আর একখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিলেন—"এটা বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড় ত। হাজার হোক, টক্ জিনিষ। লুচি-ঠাসা পেট নিয়ে এ কাব্যরস আস্বাদন করলে, আমার অম্ল টম্বল হতে পারে। তুমিই পড়।

যশোমতী পড়িতে লাগিলেন—

তেঁতুল

তেঁতুল
  তুলতুল,
    গাছে ঝোলে
      দুল্ দুল্;
        রাঙা
          টক্‌টকে,
            টক বলে
              মিথ্যুকে!

টক বলে মিথ্যুকে

রামজী
তেঁতুল,
লছমন
টোপাকুল;
জোড়াহীন
দুটি ভাই,
পথে পেলে
কিনে খাই !!

অতুল
তেঁতুল
বেশী খেলে
নাহি ভুল,
একেবারে
নির্ম্মূল,
দাড়ি গোঁপ—
সব চুল !!!

কবিতাপাঠ শেষ হইলে সুবলবাবু বলিলেন,—"শুনলে ত ? কেমন হয়েচে ?—খাসা !! ও ব্যাটারা ফেরৎ দিয়েচে ত দিয়েচেই। দুঃখ করো না। আমাকে তুমি ঐ দুশো টাকা দিও, আমিই কাবুলচন্দ্রকে, "সাহিত্য-জমিদার" নয়, একেবারে "কবি-সম্রাট" উপাধিটা দিয়ে দেব।—আচ্ছা ফক্কড়ের পাল্লায়ই পড়েচে গাধাটা। খবরদার, খবরদার, ঐ "সাহিত্য-জমিদার" উপাধির টাকাটা যেন ওকে দিতে যেও না। যদি দাও, ছেলের না হোক, তোমার নিশ্চয় অতি শীঘ্র দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে"।

যশোমতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ও হরি, এই! সর্ব্বরক্ষে!! ছেলেটা সেই তখন বলছিল বটে একমাসের মধ্যে জমিদার হবে, না কি হবে। আমি ত সাপ-ব্যাঙ কিছুই না বুঝতে পেরে ভেবেই আকুল! তাই দেখি, রাত নেই, দিন নেই, কি সব খচ্‌খচিয়ে লিখচে। অথচ লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা"!

"সাধে কি আর বলেচি, তুমি ধন্য যশোমতী! এমন পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করেচ"?

"আর তুমি বুঝি ধন্য নও? ছেলে কি আমার একলার? তুমিও ত এক মাসের মধ্যেই জমিদারের বাপ হবে! অবশ্যি, যদি দয়া করে, দক্ষিণার টাকাটা আমি দিই"।

"হ্যাঁ, তা যা বলেচ। তুমিও ধন্য, আমি ত শত ধন্য। কেন না, বাংলাদেশে ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়ে তার গর্ভধারিণীর নাম-ধামের কোনই প্রয়োজন হয় না। বেচারা বাপকে নিয়েই যত টানা-হেঁচড়া। যেমন ধর,—ঐ লোকটি,—অমুক বাবুর ছেলে, যিনি অমুক জায়গায় থাকেন, আর তমুক কাজ করেন। ধন্য বই কি, তোমার চেয়ে আমি সহস্রগুণে ধন্য।—বেশ, এখন খাওয়া ত শেষ হলো! জমিদারের বাপ হবার আনন্দে লুচিও খেয়ে ফেলেচি অনেকগুলো। আর ছোকাটা যা রেঁধেচ, পাতে যদি ছিঁটেফোঁটা না রাখতে পেরে থাকি, সেজন্যে তুমিই দায়ী।—যাক্; জমিদার বাবুটি এখন কোথায়? আহারাদি হয়েচে তাঁর"?

"অনেকক্ষণ। বোধ হয় এখন ঘুমুচ্চে,—আর—

"জমিদারীর স্বপ্ন দেখচে" ?

"তা হবে"।

স্বামী-স্ত্রী দু জনায় একসঙ্গে পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন

রাক্ষুসী

গতপ্রায় অগ্রহায়ণের এক ধূমাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে, ক্লান্তদেহে, কলেজ হইতে বাটী ফিরিয়া, বেশভূষা পরিত্যাগ ও হস্তমুখাদি প্রক্ষালন না করিয়া, কৃষ্ণকমল সরাসর বিছানায় গিয়া উঠিল। পুঁথিপুস্তক, কলমপেন্সিল ইত্যাদি রাখিবার জন্য পড়িবার ঘরে যাইবার কৃষ্ণকমলের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। যেহেতু পাঠগৃহ বলিতে যাহা বুঝায় কৃষ্ণকমলের তাহা নাই।

অপরিসর ঘরটির ঠিক মধ্যস্থলে, মেঝের উপর, তাহার শয্যা চব্বিশ ঘণ্টাই বিছানো থাকিত। সেই 'অনন্তশয্যায়' শুইয়া,

বসিয়া, কাত্ হইয়া, চিৎ হইয়া এবং সময় সময় উপুড় হইয়া, কৃষ্ণ অধ্যয়নরূপ ঘোর তপস্যায় অহর্নিশি নিযুক্ত থাকিত।

বিছানায় উঠিয়া কৃষ্ণকমল হস্তস্থিত পুঁথিগুলি ধপাস্ করিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। লেপটি স্তূপাকার হইয়া শয্যার পায়ের দিকে পড়িয়াছিল। গুড়ি মারিয়া বসিয়া কৃষ্ণ লেপখানা সর্ব্বাঙ্গে চাপাইয়া দিল। তাহার পর বই খাতা পেন্সিল টানিয়া লইয়া, ঠোঁটের কোণে জিহ্বার প্রায় অর্দ্ধেকটা বাহির করিয়া, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে যাহা মনে আসিতে লাগিল, তাহাই অতিদ্রুত লিখিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এইভাবে অতিবাহিত হইলে, নীচের তলা হইতে কৃষ্ণকমলের জননী তারস্বরে ডাকিতে লাগিলেন—"কমল, ভাত খাও এসে। আর কখন খাবে, সন্ধ্যে হয়ে এলো যে"।

একবার, দুইবার, তিনবার ডাকা হইল। কৃষ্ণকমলের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। জননীর আহ্বান তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। প্রবেশ না করিবার সম্ভাবনাই অধিক। কেন না, ততক্ষণে তাহার মস্তকটি খাতার ইঞ্চি দুই উপরে আসিয়া পৌছিয়াছে; আর রসনাটি আত্মপ্রকাশ করিয়া এত অধিক লক্লক্ করিতেছে যে চক্ষুর একটি মাত্র দৃষ্টিতেই পরিষ্কার বোঝা যায় তাহার মনটি এই জড়-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া কোনো

এক অবাস্তব পাঁজিপুঁথির রাজ্যে কচুবনে বরাহের ন্যায় পরমানন্দে বিচরণ করিতেছে।

খচাখচ্, খচাখচ্,—কৃষ্ণকমল লিখিয়াই চলিয়াছে। পেন্সিলের সীস্ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে কাষ্ঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে। লেখাগুলিও সেইজন্য সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট হইতেছে না। কিন্তু কৃষ্ণ এ সকল তুচ্ছ বাহ্যিক ব্যাপার গ্রাহ্যও করিল না। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর অর্থশাস্ত্রের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব তখন পেন্সিলের আঁচড়ে খাতার পৃষ্ঠায় প্রস্ফুটিত হইবার জন্য একেবারে মার্ মার্ কাট্ কাট্ করিতেছিল। কৃষ্ণকমল কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই অভিনব তত্ত্বগুলিকে আপনার মস্তিষ্ক হইতে একে একে মুক্তি দিয়া খাতার পৃষ্ঠায় আনিয়া ফেলিতে ব্যস্ত। এমন সঙ্গিন সময়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার রূপ নিতান্ত ইহলৌকিক একটা ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার আহ্বান তাহার নিকট, সকাল বেলা মুমূর্ষু স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আমিষপ্রিয়া প্রেমময়ী পত্নীটির জন্মের মত শেষ একবার ভেট্‌কি মৎস্যের কাঁটা-চচ্চড়ি সহ পর্ব্বতপ্রমাণ পান্ত ভোজন করিতে বসিবার মতই, নিতান্ত অসঙ্গত, অসময়োচিত ও অশোভন বলিয়া বোধ হইল।

এদিকে জননীর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি যখন দশের কোঠায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন কৃষ্ণকমলের হাতের পেন্সিলটিও লুপ্ত-সীস্ হইয়া কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বসিল। অগত্যা, লেখা বন্ধ করিয়া

যেমন সে লিখিত পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করিতে যাইবে অমনি সে শুনিতে পাইল জননী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন—"ডেকে ডেকে গলা আমার গেলো যে! ও কমল, কমল, খেয়ে যাওনা বাপু। এখনও এলে না, শেষে বলো তখন—মা, ভাত কেন ঠাণ্ডা"!

উত্তরে, কৃষ্ণকমল অনেক কথাই চীৎকার করিয়া জননীর উদ্দেশে একতলার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। সমস্ত কথা না-ই বলিলাম; তবে উহার মর্ম্ম এই যে,—সে এখন একটি জটিল 'কোশ্চেন আনসার' করিতে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত,—মরিবারও সময় নাই। এমন কি, যদি স্বয়ং যমরাজও মহিষে চড়িয়া সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি হেন দেবতাকেও পত্রপাঠ খটাখট্ মহিষ ছুটাইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। কৃষ্ণকমল এখন ইকনমিক্সের 'কোশ্চেন আন্সার' করিতে সাংঘাতিক রকম ব্যস্ত। তাহাকে যেন কেউ ভুলেও 'ডিষ্টার্ব' না করে! ইত্যাদি।

প্রত্যুত্তরে জননীও অনেক কথা বলিয়া গেলেন, এবং তাহার চুম্বক এই যে,—শুধু দিনরাত 'কোরচেনের আচার' প্রস্তুত করিলেই পেট ভরিবে না। উদরপূর্ত্তি করিতে হইলে ডাল, ভাত, তরকারি প্রভৃতি স্থূলবস্তুগুলির অত্যন্ত আবশ্যক। এই সর্ব্বজন সুবিদিত মূল সত্যটি আজ পর্য্যন্তও কৃষ্ণকমল উপলব্ধি করিতে পারিল না

বলিয়াই তাহার বক্ষের অস্থিশ্রেণী কলাইশুঁটির ভিতরকার দানা গুলির মত চক্ষু বুজিয়া গণনা করা যায়। যাহা হউক, ভাত আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার প্রত্যেক সন্ধিতে ঝিনঝিঁনে বাতের আক্রমণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি অন্নপূর্ণ পাত্র সম্মুখে করিয়া "ঠুঁটো জগন্নাথের" মত আর বসিয়া থাকিতে সম্পূর্ণ অপারগ; সুতরাং এই দণ্ডেই রন্ধনগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছেন। যদি, নিকট কিম্বা সুদূর ভবিষ্যতে, কখনও ভোজন করিতে আসিয়া কৃষ্ণ অন্নগুলি অখাদ্য তণ্ডুলে পরিণত দেখিতে পায়, তবে যেন সে তাহার প্রস্তুত ঐ 'কোরচেনের আচার' ভক্ষণ করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইহার পর—All quiet on both Fronts !!

ঘণ্টা দুই পরে, কৃষ্ণকমলের জননী দ্বিতলে আসিয়া পুত্রের কক্ষে উঁকি মারিলেন। ভূমিতলে শয্যা যথানিয়মে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় বিছানো রহিয়াছে। ওয়াড়হীন সালুর লেপখানা শয্যার ঠিক মধ্যস্থলে একটি নাতিবৃহৎ উই-ঢিপির ন্যায় বিরাজ করিতেছে। বিছানার এক পার্শ্বে, মেঝের উপর, ছোট একটি চৌকি। ঐ চৌকির উপর 'আগুন-হাত' মার্কা হারিকেনটি অত্যন্ত চড়িয়া গিয়া আলোর সহিত ভক্‌ভক্ করিয়া প্রভূত পরিমাণে ধূম্র উদ্গীরণ করিতেছে।

কিন্তু কৃষ্ণকমল কোথায়? বাহির হইতে যতটা দেখা যায়, কৃষ্ণকমলের কোনো চিহ্নই নাই। বিস্মিতা জননী চৌকাঠে হাত রাখিয়া, ঘরের ভিতর গলা বাড়াইয়া, পুনরায় চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু না, কৃষ্ণ যে ঘরে নাই! তবে গেল কোথায়? যে ঘরকুণো ছেলে; বাহিরে যে কোথাও যাইবে এমনও নয়। তবে? অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জননী উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"কৃষ্ণ"!

ঘরের ভিতর হইতেই কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল—"উঁ"!

"কোথায় তুই"?

"কেন, এই ত,"—বলিয়া, কৃষ্ণকমল মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় লেপের ভিতর হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। তাহার পর জননীর দিকে একটা ক্রুদ্ধকটাক্ষ হানিয়া বলিল,—"ফের এসেচ বিরক্ত করতে? বলেচি না, খাওয়া দূরে থাক, নিঃশ্বাস ফেলবার, কি মরবার সময়ও আমার এখন নেই? সেই জন্যেই ত লেপমুড়ি দিয়ে বসে আছি। অবাক্ করলে যা' হোক্! আমি করচি একটা ভীষণ-শক্ত 'কোশ্চেনের আনসার', আর তোমরা বাড়ি-শুদ্ধ সবাই আমাকে 'ডিষ্টার্ব' করচো—খাও খাও বলে। খাওয়া ছাড়া তোমরা আর কিছু জানলে না" বলিয়া, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, কৃষ্ণকমল পুনরায় লেপের ভিতর অন্তর্দ্ধান করিল।

কৃষ্ণের এই "অপ্রকট লীলায়" চমৎকৃতা হইয়া জননী "ন যযৌ

ন তস্থৌ” অবস্থায় কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে, তিনি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—“লেপের ভেতর কি করচিস বল্লি” ?

লেপের ভেতর কি করচিস বল্লি ?

কৃষ্ণকমল নীরব।

কোনো উত্তর আসিল না দেখিয়া জননী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—“লেপের ভেতর কি করা হচ্চে, শুনি আবার” ?

কৃষ্ণকমল এইবার আর আত্মপ্রকাশ করিল না। লেপের ভিতর হইতেই, ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের ন্যায় ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া, সে উত্তর

করিল—"আঃ, জ্বালালে দেখ্‌চি! একশো বার ত বল্লুম 'কোশ্চেনের আনসার' করচি, 'কোশ্চেনের আনসার' করচি। যাও, যাও, নীচে যাও তুমি। মেলাই বকোনা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যাও চলে"।

"আরে বাপরে, কী তিরিক্ষি মেজাজ ছেলের! যেন পারেন ত গিলে খান আর কি!—তা' বাপু, ঘরে এতসব চাট্‌নি আচার থাকতে, লেপের ভেতর ওরকম কচ্ছপটির মত বসে তুই আবার কিসের আচার তয়ের করচিস্, বল্ ত? চল, চল, খাবি চল। সেদিনকার জলপাইয়ের আচার একটু খেয়ে দেখবি আয়, কী চমৎকার হয়েচে!—উঠে আয় বাপ"।

কৃষ্ণকমল উঠিয়া আসিল না! লেপের ঢিপিটি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল। জননী শুনিতে পাইলেন কমল লেপের ভিতর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে আর বলিতেছে—"তোমরা খালি জানো— ঐ আচার আর চাট্‌নি। ডেলা ডেলা আম-তেঁতুলের আচার যদি চাকুম-চুকুম করে খুব খেতে পেলে, ত স্বর্গ কোথায় লাগে! আমি করচি 'আনসার', আর তুমি শুনলে, 'আচার'। কথা শেষ করিয়া কৃষ্ণ লেপের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া বিষম-হাসি হাসিতে লাগিল। আর জননী চৌকাঠে হাত রাখিয়া 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এক মুহূর্ত্ত পরে কৃষ্ণকমল গাত্র হইতে লেপটি দূরে নিক্ষেপ

করিয়া বিছানায় সটান উঠিয়া বসিল এবং পতনোন্মুখ কচ্ছপের খোলার চশমাটি নাসিকার উপর আঁটিতে আঁটিতে বলিল—"তুমি যা বল্লে মা, এর পর আমার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর। লিখবো, না হাসবো? হাসির চোটে পেটে আমার খিল ধরে গেল যে। লেখা টেখা এখন আর হয়েচে! তার চেয়ে বরং চল তোমার খাওয়াটাই সেরে ফেলা যাক্।"

ধুপ্ধাপ্ করিয়া একতলায় আসিয়া কৃষ্ণকমল আহারে বসিয়া গেল। ভাত, ডাল, তরকারি, কিছু ভাজাভুজি;—বাস্, আর কি চাই?—সুপ্ সুপ্—সাপ্ সাপুৎ সুপ্!

কৃষ্ণকমল দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া একেবারে ঝড়ের বেগে সমাধা করিতে লাগিল। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার। মৎস্যের কাঁটাটি সাবধানে বাছিয়া ফেলিবার হাঙ্গাম নাই, কুটোটি উস্প্ উস্প্ করিয়া চুষিবার পরিশ্রম নাই, মুড়োটি কড়্মড়্ করিয়া চর্ব্বণ করিবার ঝক্মারিও তাহাকে পোহাইতে হয় না। একেবারে সাত্ত্বিক আহারের চূড়ান্ত সে করিয়া থাকে। তাহার কারণও আছে যথেষ্ট। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পর, বহু কান্নাকাটি করিয়া, সে সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই, বাস্,—মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ একেবারে ত্যাগ হইল। পেঁয়াজ এবং মসুরি ডালের বাড়িতে প্রবেশ করিবার লাইসেন্স নাকচ করিয়া দেওয়া হইল। এমন কি, পাছে "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্"

করিয়া ব্রত ভঙ্গ হয় এই ভয়ে, সে পলাণ্ডুগন্ধী অহিন্দু সহপাঠীদের সঙ্গে ক্লাশে এক বেঞ্চিতে উপবেশন করা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল। তা' ছাড়া, ত্রিসন্ধ্যা নানা আসন ও মুদ্রা সহকারে প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিয়া অধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যে সে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে এই গুহ্য সংবাদটি তাহার কোনো কোনো বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট স্বমুখে প্রকাশ করিতে আমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি।

অনেকে ইহা কৃষ্ণকমলের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারেন, কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিবার পর হইতে সে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিল যে এম.এ পরীক্ষাটি পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হিমালয় যাত্রা করিবে এবং মানস সরোবরের তীরে এক সুরম্য কুটির বাঁধিয়া সেইস্থানে ভজনানন্দে জীবন অতিবাহিত করিবে।

যাহা হউক, তাহার হিমালয় যাত্রার এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। কেননা, কৃষ্ণকমল সবে এখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বি. .এ. পাশ করিবে, এম. এ. পাশ করিবে—তাহার পর হিমালয় যাইবার পালা। আপাততঃ, এক হাঁটু পিঁড়ের উপর এবং অন্যটি মস্তকের সমান্তরালে রাখিয়া সে আপনার দশনশ্রেণী 'ড্রিল' করাইতে ব্যস্ত।

কৃষ্ণকমলের জননী নিকটে বসিয়া পুত্রের আহার দেখিতেছেন

এবং ক্ষণে ক্ষণে এটুকু ওটুকু সেটুকু গ্রহণ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিতেছেন। যথা—

"অত শুক্নো শুক্নো খাচ্চিস কেন? আর একটু ডাল নে না। দেব একটু ডাল?"

"না"।

"এক মুঠো ভাত"?

"না না"।

"আর দু'খানা আলুভাজা নে"।

"না না না"।

"বেগুন ভাজা তবে দি এক খানা?"

"না না না না"।

"তবে ফুল-কপির ডাল্না আর একটু খা"।

"না না না না না;—দেত্তেরিনা, খেতে বসেচি, তাও জ্বালাবে? বলিয়া, কৃষ্ণকমল দস্তুরমত ক্ষেপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শেষ গ্রাসটি মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া হড়্‌হড়্‌ করিয়া থালায় জল ঢালিয়া দিল। মুখের গ্রাসটি যখন গলাধঃকরণ করা হইয়াছে তখন সে বলিল—"খাইয়ে খাইয়ে ছেলের পেটে চড়া পড়িয়ে দিতে চাও বোধ হয়"?

কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে জননী কহিলেন—"রক্ষে কর, যে তোমার খাওয়া! চার পাঁচ বছরের ছেলেটিও তোর চেয়ে ঢের বেশী খায়।

এই এম্নি করে চড়ুই পাখীর মত খুঁটে খুঁটে খাস্ বলেই, চেহারা-খানাও তোর দিনকে দিন হচ্চে যেন ঐ চড়ুই পাখীর মতই। —মাছ খাবিনে, দুধ খাবিনে, ভালো একখানা দ্রব্যি তুলে রাখলে, খাওয়া দূরে থাক্, ছুঁড়ে ফেলে দিবি! তার ওপর, না মাথায় এক ফোঁটা তেল, না শরীরে একটু তেলের চিন্নি! চুল-গুলো হয়েচে যেন শণের নুড়ো! শীতকাল, রুক্ষ থেকে থেকে দেহটি যা অপরূপ হয়েচে, আহা! অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে, দেহটি হবে জোয়ালো—পাথরের মত শক্ত। তা' নয়, না খেয়ে খেয়ে চমৎকার হাড়গিলের মত চেহারা তয়ের হচ্চে। এরপর যখন সংসারে ঢুকবে—"

কৃষ্ণকমল ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল—"কে বলেচে তোমায় যে আমি সংসারী হব? সংসারী ত হব না আমি। এম. এ. পাশ করেই আমি গুরুদেবের কাছে হিমালয় পর্ব্বতে চলে যাব"।

"হ্যাঃ, তোমার এখন হিমালয় পর্ব্বত যাওয়া বাকি আছে! বলে—এ্যাঙ যায়, ব্যাঙ যায়, খল্‌শে পুঁটি বলে আমিও যাই" !!

কথা শুনিয়া কৃষ্ণকমলের মুখখানা ছাইয়ের মত পাংশু হইয়া গেল। এমন অপমানজনক তুলনা মা হইয়া ছেলের সম্বন্ধে কেহ কস্মিনকালে কখনও করিয়াছে? কৃষ্ণের কান্না আসিতে লাগিল; কিন্তু ক্রন্দন চাপিতে গিয়া ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত। অত্যন্ত তিক্ত-কণ্ঠে সে বলিল—"কেন, খল্‌শে পুঁটি বুঝি আর মানুষ নয়? যত

মানুষ হলো গিয়ে তোমার ঐ এ্যাঙ আর ব্যাঙ! খালি খালি আমার পেছনে লাগা; দাঁড়াও, মজা টের পাওয়াচ্চি” বলিয়া, কণ্ঠ উচ্চে তুলিয়া সে চীৎকার আরম্ভ করিল—“ও ঠাকুমা, ঠাকুমা, দেখে যাও; একবারটি নীচে এসে দেখে যাও গো, কি আরম্ভ করেচে মা। খেতে বসেচি, আর খামকা খামকা আমাকে খল্‌শে, পুঁটি, এ্যাঙ, ব্যাঙ,—যা মুখে আসচে, তাই বলচে। দেখে যাও এসে”।

“কী মিথ্যেবাদী! তোকে বল্লুম আমি ঐ সব? আমি শুধু একটা কথার কথা বল্লুম মাত্র। ইঃ, ভারি জব্দ করেচে আমাকে; মা আমায় গিলে খাবেন যেন”!

কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া কৃষ্ণকমল হাঁকিল—“ওগো ঠাকুমা, এই দেখ এসে, আবার বলা হচ্চে,—মা আমায় গিলে খাবেন যেন”।

তসরের থান পরিহিতা এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধা, ঘিয়ে রঙের একখানা মোটা চাদরে দেহ-আবৃত করিয়া দ্বার ঠেলিয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। তারপর দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া পৌত্র ও পুত্রবধূর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন—“কি হয়েচে বৌ, কৃষ্ণ এত চেঁচামেচি করচে কেন”?

কৃষ্ণকমলের জননী সহাস্যে বলিলেন—“কি আর হবে, পাগলের পাগলামো! জিজ্ঞেস করুন না ওকে কি হয়েচে।

তেল না মেখে মেখে ওর চুলগুলো শণের নুড়ো হয়েচে এই বলেছিলাম, আর—"

কৃষ্ণ জননীকে বাধা দিয়া বলিল—"শুধু শণের নুড়ো ?—আর পুঁটি, খল্‌শে, এ্যাঙ, ব্যাঙ,—এ সব বুঝি বলনি" ?

"বলেচি বেশ করেচি। ছোট মুখে বড় কথা আমার বরদাস্ত হয় না বাপু। একটুখানি ছেলে, তা তিনি যাবেন হিমালয় পর্ব্বতে! পেট ভরে সেই জন্যে ভাত খাবেন না; মাছ, দুধ, ঘি, ঘিয়ের জিনিষ, কিচ্ছুটি খাবেন না। গায় মাথায় তেল মাখবেন না। কাঁড়ি কাঁড়ি সাগু কি সুজির কাই বিছানায় বসে খেতে দাও, তবেই মহানন্দ! আর যদি না খেয়ে, না নেয়ে, চব্বিশ ঘণ্টা লেপমুড়ি দিয়ে ঐ ছাইয়ের 'কোরচেনের আচার' করতে পেলেন, তবে ত হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরা গেল। আমি রাগ করি কি আর সাধ করে ? তোর যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখে শরীর আপনি জ্বলে ওঠে"।

"উঠুক জ্বলে, আমার ভারি তাতে বয়েই গেল। তোমাদের ইচ্ছে মত খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা করলে আমার ত একেবারে চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে। আরে, এই যে কলেজের সব প্রফেসাররা যাকে তাকে বলে বেড়ান,—"'কেকেঘোষ্' কলেজের সেরা ছেলে" এ তোমার ঐ সাগু আর সুজির কাই খেয়েই হয়েচে গো, কাই খেয়েই হয়েচে। দুধ-ঘিয়ের কোনোই দরকার হয় নি, বুঝলে ?

ঘি, দুধ,—এসব হলো গিয়ে জান্তব খাদ্য,—যাকে বলে animal food! এসব খেলে বুদ্ধিশুদ্ধি সুদ্ধ সব দু'দিনে জান্তব হয়ে উঠবে, যেমন তোমাদের এক এক জনার হচ্চে"।

শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া কৃষ্ণকমলের জননী কহিলেন—"শুনলেন মা ছেলের কথা? এখন বলুন দেখি কি করতে ইচ্ছে করে ওকে"?

বৃদ্ধা স্মিতমুখে পৌত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বৌ ত ঠিক কথাই বলেচে, কৃষ্ণ। এতসব বাড়াবাড়ি কি ভালো? ঘরের একটি মাত্র ছেলে তুমি; তোমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব, বল দিকি দাদা? তুমি যদি ভালোমন্দ কিছুই দাঁতে না কাটো, তবে বাড়ির আর সবাই সে সব বস্তু কি করে মুখে তুলে দেবে বল দিকি"?

"আপত্তি থাকে, মুখে তুলে না দিলেই ত সব গোল চুকে যায়। কেউ মাথার দিব্যি দিয়েচে মুখে তুলে দেবার জন্যে? কী আশ্চর্য্য সব ব্যাপার! আমি করচি একটা বৃহৎ সাধনা, আর তোমরা সবাই আমার পেছু নিয়েচো কি করে আমার সব ভুণ্ডুল করে দেবে, কেমন?—তোমরা সবটাতেই আমার সঙ্গে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে এসো না। আমি কি করি, কেন করি, সে সব তোমাদের বোঝ্বার সাধ্যি নেই। ধর, এই অল্প অল্প খেয়ে শরীরটাকে যে আমি এমন মুনি ঋষিদের মত করচি,

তার মানে কি? তার মানে,—শাস্ত্রে আছে, মহাপ্রাণী বা পরমব্রহ্ম দেখতে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ। সেই জন্যেই সেকেলে সব ঋষি মুনিরা না খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে শুকিয়ে চামচিকের মত করে ফেলতেন। যে যত হাতের এই বুড়ো-আঙ্গুলের মত ছোট্টো হতে পারতেন, তারই তত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ পরমব্রহ্মত্ব লাভ হবার সম্ভাবনা অধিক ছিল। আরে, আমিও ত সেই সাধনাই করচি। দেখি কত দিনে বলতে পারি—"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শিবোহং শিবোহং"। যাক্ গে—তোমরা এসমস্ত spiritual talk বুঝবে না"।—

বাহির হইতে প্রবল একটা ধাক্কা খাইয়া রন্ধনশালার কপাট বোমাফাটা শব্দ করিয়া খুলিয়া গেল। আশমানী রঙের ছোট একখানা আলোয়ান দেহে জড়াইয়া এক চতুর্দ্দশী কিশোরী শীতে হি হি করিতে করিতে কৃষ্ণকমলের আহারস্থানে হুড়্মুড়্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে, উন্মুক্ত দ্বারপথে, এমন একটা শীতল বাতাস গৃহে আসিয়া ঢুকিল যে শীতবিদ্ধ কৃষ্ণকমল তেরিয়া মেরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"দরজা বন্ধ কর্ কানি, শীগ্গির দরজা বন্ধ কর্"।

ধমক খাইয়া কৃষ্ণকমলের ভগ্নি কানুপ্রিয়া দৌড়াইয়া গিয়া উন্মুক্ত কপাট রুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিল। এখন বসা যায় কোথায়? কিশোরী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। কিন্তু

কোনো স্থানই তাহার মনঃপূত হইল না। অবশেষে জননী ও পিতামহীর মধ্যস্থলে বিঘৎ-পরিমাণ স্থানটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িতেই ঠেসাঠেসি করিয়া সে সেই ফাঁকে কায়েমীভাবে বসিয়া পড়িল।

মৃদু তিরস্কারের সুরে জননী বলিয়া উঠিলেন—"দেখ মেয়ের দৌরাত্ম্যি! এত জায়গা থাকতে এখানে এলেন গোঁজাগুঁজি করতে। ঐ পিঁড়েটায় বোস গে না যা"।

পিতামহী একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন—"আহা, থাক্ থাক্, বসুক এই খানটায়"।

ঠাকুরমাতার সহানুভূতি পাইয়া কানুপ্রিয়া আরও বেশী জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—"দেখ ত ঠাকুমা, এখানে তোমাদের দুজনার মাঝখানটায় একটু গরমে বসেচি, তা মায়ের একেবারে অসহ্য। যা শীত, একলা ঐ ফাঁকা পিঁড়েটায় বসে থাকা যায়? দাও ত ঠাকুমা, তোমার পেটের ভেতর থেকে আগুনের মালসাটা একবার দাও ত; হাত পা গুলো একটু সেকি। বাপ রে! এবার যা শীত পড়েচে, হাত পা যেন কেটে নিচ্চে"।

বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে গাত্রবাসের ভিতর হইতে ছোটো একটি মৃৎপাত্র বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন—"এই নাও দিদিমণি; তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদেরই এত শীত! আমরা বুড়ো মানুষেরা তা' হলে বাঁচব কেমন করে"?

আগুনের মালসাটি কিছুকাল নাড়িয়া চাড়িয়া, অবশেষে পিতামহীর দিকে উহা ঠেলিয়া দিয়া কানুপ্রিয়া বলিল—"নাও ঠাকুমা, তোমাব আগুনের মালসা দিয়ে তুমিই আগুন পোয়াও। কিছু কি আর ওতে আছে ?—সব ছাই হয়ে গেছে কোন কালে! এক মালসা ছাই কোলে করে বসে খুব আগুন পোয়াচ্চ যা' হোক্" !

পিতামহী পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"দাও দিদি, দাও; তোমাদের এখন ছাইয়ের মালসায় শরীর গরম হবে না। ওসব আমাদের বুড়ো মানুষের জন্যে। তোমাদের এখন চাই, তরুণ অরুণের মিষ্টি পরশ! আর ঘণ্টা দুই সবুর কর দিদিমণি, অরুণকুমার এলো বলে। অরুণোদয় হলে তখন দেখবে শরীর আপনা থেকেই চন্‌চনে গরম হয়ে উঠবে" বলিয়া, আপনার রসিকতায় অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়া, পৌত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতামহীর এই সরস পরিহাস কৃষ্ণকমলের নিকট অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল বোধ হওয়ায় সে রীতিমত খ্যাঁ খ্যাঁ করিয়া উঠিল—"চুপ্, একদম চুপ্! তোমাদের ওসব সাংসারিক অশ্লীল কথাবার্ত্তা আমার সামনে বলতে পাবে না। ছি ছি ছি, এসব গর্হিত কথা আবার মুখে আনে! দাড়াও, আসুক বাবা বাড়ি, এসব কথা তাঁকে না বলে দিয়েচি ত আমার নামই

'কেকেঘোষ্' নয়।—দেখ্ কানি, ঠাকুমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিসনে; দু'দিনে তোর মাথাটি পরিষ্কার খেয়ে বসবে।—আর, দেখ মা, তোমরা কানিকে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাটি করে ফেল্লে। এত বড ধিঙ্গি মেয়ে, এখন পর্য্যন্ত ওর সেই কোন মান্ধাতার আমলের 'সাহিত্য সুধা', NEW ENGLISH READER আর SIMPLE ARITHMETIC ই শেষ করতে পারলে না। লেখাপড়া ওর হবে কি ছাই! যেমন তোমরা আদর দিচ্চ, অরুণটা আবার তারও ওপরে এক কাঠি। ওর আর লেখাপড়া হয়েচে!—এই কানি, তুই যে বড় এখানে এসে বসেচিস্?—যা, পড় গে না বসে ওপরে; বিয়ে হয়েচে ত সবাইর মাথা কিনেচ, কেমন? আমি তখনই বলেছিলাম,—এত অল্প বয়সে বিয়ে দিলে, ওর লেখাপড়া এইখানেই খতম্! হয়েচে কিনা তাই, দেখ। কি দিনে, কি রাত্তিরে, পনেরো মিনিটের জন্যেও যদি এখন ও বই নিয়ে বসে। আমাদের এমন 'এডুকেটেড্ ফ্যামিলি'! তার মধ্যে ওটা হবে যেন একটা 'ইল্লিটারেট' ভূত কি পেত্নী! আর অরুণই বা কি বলবে বল ত? বলবে 'খনে, কানি যেন 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'! দেখে নিও তখন তোমরা"।

আমেরিকায় তারা কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাইয়া থাকে। যে ফল গাছে থাকিয়া তিন মাসে পক্ক হয়, এ্যাথেলিন গ্যাসের সাহায্যে সেই ফল তাহারা তিন ঘণ্টায় পাকাইয়া লয়। সেই কৃত্রিম

উপায়ে পাকানো ফল স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে, স্বাভাবিক পক্কফল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।

কানুপ্রিয়া যেন এ্যাথেলিন গ্যাসে পাকানো লাল টুকটুকে একটি ফল! মাস ছয় হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে! বিবাহের পূর্ব্বে সে ঠিক গৃহস্থ ঘরের আর পাঁচটী মেয়ের মতই অতি সাধারণ গোছের ছিল। কিন্তু বিবাহের-জল গায়ে পড়িতেই, যেন কোন এ্যাথেলিন গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া, চৌদ্দ বৎসরের কানুপ্রিয়া ছয় মাসের মধ্যে কুড়ি বৎসরে পদার্পণ করিল। লেখাপড়ায় অবশ্য সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু বুদ্ধি তাহার শেফিল্ডের ক্ষুরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ হইল; বাক্‌পটুতায় মিসেস্ সরোজিনী নাইডু তটস্থা; বেশ-ভূষায় ঠাকুর-বাড়ির মহিলারা লজ্জিতা; এবং সাধারণ বুদ্ধি তাহার এরূপ অসাধারণ হইয়া উঠিল যে সেই ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে সে তাহার ভীষণ-রকম-বিদ্বান দাদাটিকে পর্য্যন্ত সময় সময় ক্ষত বিক্ষত করিয়া ছাড়িত।

কৃষ্ণকমলের শেষ কথাটি মুখ হইতে লুফিয়া লইয়া কানু মহা কলরব করিয়া উঠিল—"দাদা, দাদা, তুমি না আস্‌চে বছর বি-এ পাশ দেবে? এখন থেকেই ত দেখচি তোমার খাতায় "কেকেঘোষ্, বি-এ" "কেকেঘোষ্, বি-এ" লিখে লিখে পাতা সব বোঝাই করে ফেলেচ! দেখতে চাও বুঝি ঐ "কেকেঘোষ্, বি-এ"

লিখলে কেমন দেখায়, আর বল্লে কেমন শোনায়, না? বি-এ ত হবে, কিন্তু আজ একি বোকার মত কথা বল্লে, বল দিকি? তোমাদের "এডুকেটেড্ ফ্যামিলি"তে আমি যদি "ছিল্লিটারেট" ভূত কি পেত্নীই হই, তবে ও আমাকে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' বলবে কেন?—বলবে, 'প্রহ্লাদকুলে দৈত্য' "।

কনিষ্ঠার মুখে 'বোকা' আখ্যা পাইয়া কৃষ্ণকমল আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"একশো বার বলবে তোকে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'। আমাদের লেখাপড়া-জানা-বংশে তুই যেমন গাধী হয়ে রইলি, তেমন তোকে ত বলবেই ও কথা। ইঃ, বল্লুম বোকার মত কথা! তোর বুদ্ধি আজকাল বুঝি খুব বেড়েচে মনে করিস? দাঁড়া, আসুক বাবা বাড়ি, একথা যদি আমি তাঁকে না বলে দিয়েচি! আর কাল তুই অরুণের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে মসুরির ডাল রেঁধেছিলি তাও বলবো। দেখো তখন বকুনির ঠেলা। আমাকে বল্লি 'বোকা'? হ্যাঁ, এতদূর হয়েচে তোর? দেখি ত আজ কে যায় অরুণকে ডেকে নিয়ে আসতে। আমি পারবো না বাবা এই শীতে কলুটোলা গিয়ে জামাইকে ডেকে আনতে, বুঝলে মা?"

জননী নরম সুরে কহিলেন—"তা কি হয়রে বাবা! নতুন জামাই; সকালে একজন নেমন্তন্ন করে এসেচে, এখন কেউ ডাকতে না গেলে সে আসবে কেন"?

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া কৃষ্ণ উত্তর দেয় "না আসতে চায়, ঘরে বসে চাট্টি ভাত কচু-পোড়া দিয়ে বেশী করে খায় যেন! এ সব কী বিশ্রী নিয়ম-কানুন তোমরা তৈরা করচো মা? সকালে এক জন নেমন্তন্ন করে আস্‌বে, রাত্তিরে জামাই আপনি আসবে। তা' নয়, আবার রাত্রিবেলাও যাও আর একজন তাকে সাধ্যিসাধনা করে ডেকে আনতে! আমি পারবো না কক্ষনো। আসতে হয় সে আসুক, না আসতে হয়, না আসুক; আমার তাতে কোন ঘোড়ার ডিম!—ওদিকে আসবার জন্যে দেখগে যাও জামাইবাবু এক পা এগিয়ে বসে আছেন। আমি কতদিন গিয়ে দেখেচি উনি সেজেগুজে ঘরবা'র করচেন। আরে, আসবার জন্যে এতই যখন ছট্‌ফটানি, তখন সড়সড়িয়ে চলে এলেই ত হয়! আবার শ্বশুর-বাড়ি থেকে ডাকতে আসার অপেক্ষা কেন"?

মুচকি হাসিয়া বৃদ্ধা পিতামহী বলিলেন—"অপেক্ষা কেন, সে দাদা তোমার বিয়ে হলে তখন তুমি বুঝতে পারবে। বিয়েটা হোক আগে, তখন সাধ্যিসাধনা করে ডেকে নিয়ে না গেলে তুমি ও যেতে পারবে না; তাতে কনের জন্যে ভেবে ভেবে পেটটি যদি তোমার ফেঁপে জয়ঢাক হয়ে ওঠে, তাও স্বীকার"।

কৃষ্ণকমল তর্জ্জনী ঘর্ষণে জলপূর্ণ থালা হইতে একপ্রকার ক্যাঁ কোঁ শব্দ বাহির করিতেছিল। পিতামহীর বাক্যে সেই অভিনব জলতরঙ্গ-বাদ্য বন্ধ করিয়া, গম্ভীর মুখে সে বলিল—"ঐ কদর্য্য

কথাগুলো আর বলা অভ্যেস করো না, ঠাকুমা। কী ভয়ঙ্কর কুরুচিপূর্ণ, কী বীভৎস যে এসমস্ত তোমাদের রঙ্গরস তা আমি কিছুতেই আর তোমাদের বুঝিয়ে উঠতে পারলুম না। যখন তোমরা এ সমস্ত অশ্লীল কথা বল, তখন আমার মনে হয়, কেউ যেন আমার কানে গালানো সীসে ঢেলে দিচ্চে। কান আমার পুড়ে যায়, দেহ আমার জ্বলে যায়, আর প্রাণটা একেবারে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে থাকে" বলিয়া, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে, কৃষ্ণকমল গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার রকমসকম দেখিয়া মাতা ও পিতামহী "পতন ও মূর্চ্ছা" ভাবাপন্না হইয়া রহিলেন।

কানুপ্রিয়া কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার অগ্রজটি যে প্রকার গুরুগম্ভীরমুখে বসিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার হাসিয়া ফেলিবার সাহসও হইতেছিল না। সুতরাং অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, পক্ষীর কূজন সদৃশ একটা অস্ফুট শব্দে সে বৃথাই তাহার উত্থিত হাসি দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

কনিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকমল বেশ বড় রকমের একটা ভেংচি কাটিয়া কহিল—"এ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা, কী যে হাসি! খালি জানো দাঁত বের করে হাস্‌তে। দন্ত বিকাশ করে কেলাইভ্ ইষ্ট্রিট্ করে ফেল্লেন একেবারে!

যে তোমার পোকায়-খাওয়া দাঁত, তার আবার একটুতেই অত হ্যা হ্যা হি হি!—বের হ এখান থেকে, হতচ্ছাড়ি।—Get out!

কানুপ্রিয়া কিছু মাত্র ভয় না পাইয়া হাস্যোচ্ছাসিত কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ঈঃ, get out বই কি! Not get out—what do?"

এত বড় অপমান মুখ বুজিয়া সহ্য করা কৃষ্ণকমলের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তড়াক্ করিয়া আসন ছাড়িয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। কচ্ছপের খোলার চশমাটি পুনরায় তাহার নাসিকাচ্যুত হইবার উপক্রম করিতেছিল। তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইয়া লইয়া, ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে সে বলিল—"কী বল্লি রে উনুনমুখী, আমার মুখের ওপর কথা! দাঁড়া, আসুক বাবা বাড়ি, সব কথা বলে তোর দেঁতো মুখ থেঁতো-না করেচি ত ত ত—"

ক্রোধবশতঃ কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, বাহির হইবার জন্য সে দরজার নিকট ছুটিয়া গেল। সেখানে পৌছিয়া, কি মনে করিয়া সে পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং জননী ও পিতামহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"তোমরা দু'জনেই সাক্ষী থাকলে, কানি আমাকে কেমন অপমান করলে। আজ যদি আমি ওর বরকে ডাকতে যাই, তবে, এই এম্নি করে, তোমরা সবাই আমার গায় থুথু দিও"

বলিয়া, সশব্দে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে করিতে, কৃষ্ণকমল কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রন্ধনগৃহে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা কিয়ংকাল একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওই করিতে লাগিলেন। কাহারো মুখে আর কথাটি নাই। অবশেষে কৃষ্ণকমলের জননী ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—"একেবারে বদ্ধ পাগল! একটি মাত্র ছেলে, তাও কপালদোষে এমনতর যে হবে—"

পিতামহী বলিলেন—"তা যেন হলো; এখন অরুণকে আনাবার কি? কৃষ্ণ যে রকমটা রেগেচে, তাতে ও যে যাবে, আমার একটুও মনে হয় না। দেখলে একবার থুথু ফেলার ছিরি? দাও ত ওখানটায় এক ঘটি জল ঢেলে।—তুমি দিদিমণি যেমন দাদাকে রাগালে, তেমন শোওগে আজ তোমার আশী বচ্ছরের বুড়ো ঠাকুর্দ্দার কাছে। আজ আর অরুণোদয় হচ্চে না"।

মুচকি হাসিয়া কানুপ্রিয়া বলিল—"হচ্চে না ত, হচ্চে না; আমার তাতে চোখ থেকে ঘুম পালাবে না। ইঃ, ও আসবে না বলে আমার চেয়ে তোমার দুঃখটাই যে দেখচি একেবারে উথ্‌লে উঠেচে। কেন গো ঠাকুমা, কেন, বুড়ো মানুষ বলে ঠাকুর্দ্দাকে আর মনে ধরে না বুঝি"?

কন্যার বাক্‌চাতুর্য্যে কানুপ্রিয়ার জননী হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"ঐ মদ্দানীর সঙ্গে আপনি কথায় পেরে উঠবেন না, মা। এম্নি ওর কথার বাঁধন ছাঁদন যে, মুখ যখন ছোটে, তখন আপনার নাত্‌জামাইটি পর্য্যন্ত কেঁচো হয়ে যায়;—তা' হোক্ না সে কলেজে-পড়া বিদ্বান ছেলে। আর, কৃষ্ণর অবস্থাটা ত আপনি স্বচক্ষেই দেখলেন।"

বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পিতামহী সরল হাস্য করিয়া বলিলেন—"তাই ত দেখচি। শুন্তে পাই, আজকাল মান্দ্রাজে না কোন লঙ্কায় মেয়েরা মাথায় শামলা এঁটে ওকালতী করতে বের হয়। তুমি দিদিমণি যদি বালিষ্টর হয়ে, ধড়াচূড়ো পরে, বক্তিমে করতে লেগে যাও, তবে বিপক্ষকে নাকের জলে চোখের জলে একাক্কার করে দিতে পারবে।—যাক্, এখন অরুণকে আনাবার কি করা যায়, বৌ? ওবেলা নেমন্তন্ন পাঠিয়ে, এবেলা কারো ডাকতে না যাওয়াটা যে বিষম লজ্জার কথা হবে! কৃষ্ণকে একবার পিঠে হাত বুলিয়ে, বাছা, ধন, করে বুঝিয়ে বল্লে হয় না?"

জননী কিছু উত্তর করিবার পূর্ব্বেই কানুপ্রিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমরা মিথ্যে অস্থির হয়ে উঠেচ, ঠাকুমা। তোমাদের কাউকে কিছু বলতে কইতে হবে না। দেখে নিও, আপনার গরজেই ওঁকে আনবার জন্যে দাদাকে কলুটোলা ছুটতে হবে। এই এতক্ষণ ধরে যে সব ছাইপাশ লিখলে, সেগুলো ওঁকে না পড়ে

শোনালে দাদার যে রাত্তিরে আজ ঘুমই হবে না। সেই জন্যেই ত আজ কলেজ থেকে ফিরে, না খেয়ে না ধুয়ে, এত লেখার ধূম!—ওঁকে সব পড়ে শোনাবে,—লেখা কাটবে, ছিঁড়বে, আবার পড়বে, শেষে দশের ভেতর কত নম্বর পাবে তা অবধি জেনে নিয়ে তবে দাদার শান্তি। যা বল্লুম আমি দেখে নিও সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে"।

কিন্তু তাহার অভয়বাণীতে মাতা কিম্বা পিতামহী কেহই বিশেষ আশান্বিতা হইতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া কৃষ্ণকমলের জননী কার্যান্তরে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। পিতামহীও আপনার কক্ষে গিয়া, কুঁড়োজালি পাড়িয়া, এক কোণে বসিয়া পড়িলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত তুলসী-কাষ্ঠের মালা ঘুরাইয়া নিঃশব্দে 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

রন্ধনগৃহে একাকিনী বসিয়া কানুপ্রিয়া কিছুকাল উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু একা একা আর কতক্ষণ বসিয়া থাকা সম্ভব? অবশেষে তাহাকেও উঠিয়া পড়িতে হইল। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই গৃহপালিতা মেনী-বিড়ালটি তাহার সম্মুখে পড়িল। "মর্‌ পোড়ামুখী, খালি হেঁশেলে ঢোকবার চেষ্টা" বলিয়া কানু উহার পৃষ্ঠে এক লাথি বসাইয়া দিল। পোষামেনী এমন অপ্রত্যাশিতরূপে সম্মানিতা হইয়া ম্যাও ম্যাও রবে দূরে

পলাইল। বিড়ালিনীর ঐ সরব প্রতিবাদের যদি আমরা এই অর্থ করি যে—'হে কানুপ্রিয়ে, সম্প্রতি লাঙ্গুল প্রদর্শন করিলাম বটে, কিন্তু ইহা কখনওই মনে স্থান দিও না যে তোমাদের ঐ হেঁশেলটি গোয়ালিয়র ফোর্টের ন্যায় সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য', তাহা হইলে আমাদেব নিতান্ত কদর্থ করা হইবে না।

সন্ধ্যার অনতিপরে, উত্তর হইতে একটা তুষার-শীতল বাতাস বহিয়া শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

দ্বিতলে আপনার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া কানু উত্তর দিকের খোলা জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল। গৃহমধ্যে একটি হারিকেন মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। আলো বাড়াইয়া কানু দর্পণে মুখ দর্শন করিল। সমস্তই ঠিক আছে। কবরীবদ্ধ কেশপাশ, সিঁথির সিঁদুব, কপালের টিপ, ইস্তক মিহি করিয়া টানা চোখের কাজল রেখাটি, সব নিখুঁত। 'আত্মদর্শনে' সন্তুষ্টা হইয়া কানু শয্যাশায়িনী হইল। পার্শ্বের কুলুঙ্গিতে তাহার পুঁথিপুস্তক গুছান ছিল। সেখান হইতে যাহা হাতে আসিল তাহাই টানিয়া লইয়া সে দেখিতে পাইল, পুস্তক খানা "শিশুপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস"। যে প্রথম আসিয়াছে, তাহার দাবীই অধিক। কানু ইতিহাস পড়িতে লাগিল।

দশ মিনিটের মধ্যে, অনেক আছাড় হোঁচট খাইয়া, সে

হুমায়ুনের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত সব শেষ করিল। তাহার পর আকবর আসিয়া উপস্থিত।

কানুর মস্তকের ভিতর সমস্তই কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যাইতেছিল। চোখে যেন তাহার কেউ খানিকটা লঙ্কা-বাটা লেপিয়া দিয়াছে, এমনই তীব্র জ্বালা। কিন্তু, লেখাপড়ায় অমনোযোগিনী এ কলঙ্ক তাহার দাদা ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে দিতে পারিবে না। নেত্রারূঢ়া নিদ্রাদেবীকে অগ্রাহ্য করিয়াই কানুপ্রিয়া পাঠ আরম্ভ করিল—'আকবর হুমায়ূন-মহিষীর গর্ভে, রাজপুতানার মরুভূমিতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'। লাইনটি একটু দীর্ঘ বলিয়া দুই তিন বারে উহা পড়িতে হইল। প্রথম বার সে দুই চক্ষু চাহিয়াই পড়িল। দ্বিতীয় বার পড়িবার সময় চোখ দুটি তাহার ঢুলিয়া আসিতে লাগিল। তৃতীয় বারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে পাঠ চালাইল—'আকবর,—আকবর,—হুমায়ুনের গর্ভে,—আকবর,—রাজপুতানা.—আকবর—আক—আ—আ আ——!!

দ্বিতীয় স্বরবর্ণটি নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে কানুপ্রিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, এবং কতক্ষণ ঘুমাইল, তাহা সে কিছুই জানে না। হঠাৎ ঘরের বাহিরে পিতামহীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সে শুনিতে পাইল, ঠাকুরমা বলিতেছেন—"উঠে

এসো দিদিমণি, উঠে এসো। অরুণ উদয় হয়েচে যে! তুমি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্চ, ওদিকে দেখগে যাও দাদা তোমার বরকে দখল করে বসে আছেন। উঠে এসো; খাবার ঠাঁই করে দাও এসে। রাত দশটা কোন কালে বেজে গেছে যে"।

"যাচ্চি ঠাকুমা, যাচ্চি" বলিয়া, কানু শয্যাত্যাগ করিয়া পুনরায় দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বনাশ—

"রজনী জনিত গুরু প্রজাগর
রাগ কষায়িত আঁখি"

এখন উপায়? উপায় আর কি, যাহা হয় হইবে, মনে করিয়া কানু মুখ টিপিয়া হাসিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি চূর্ণকুন্তল সাবধানে বিন্যস্ত করিয়া, মস্তকে ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, একতলায় যাইবার জন্য সে সিঁড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর কি ভাবিয়া নীচে না যাইয়া নিঃশব্দে সে তাহার দাদার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা ঈষৎ ভেজান ছিল। ফাঁক দিয়া উকি মারিয়া সে দেখিতে পাইল,—অরুণকুমার শিখী-চ্যুত নবকার্ত্তিকটির মত সাজিয়াগুজিয়া বসিয়া আছেন, আর মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে কৃষ্ণকমল, হস্তে এক তাড়া কাগজ লইয়া, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিরাজমান। কানুপ্রিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার দাদার কণ্ঠস্বর শুনিতে

পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর শ্যালক-ভগ্নীপতিতে কথা হইতে লাগিল—

"আর, আমাদের গোল বাঁড়ুয্যে মশায় কি বলেন জানেন"?

"গোল বাঁড়ুয্যে মশায়টি আবার কে হ্যা"?

কৃষ্ণকমলের উচ্চহাস্যধ্বনি শোনা গেল। তারপর—

"জানেন না বুঝি? আমাদের ইকনমিক্‌সের প্রফেসার সদানন্দ বাঁড়ুয্যে। মুখখানা তাঁর সার্কলের মত গোল বলে ক্লাশের কবিরা তাঁর 'গোল বাঁড়ুয্যে' নাম রেখেচে; ঐ নামেই তিনি ছাত্রমহলে পরিচিত"।

"ওঃ, এই! কলেজে গিয়ে বুঝি এই সব মৌলিক গবেষণাই করা হয়? মন্দ নয় যা হোক্! মুখখানা গোল বলে বাঁড়ুয্যে মশায়ের নাম হলো 'গোল বাঁড়ুয্যে'! কোন দিন শুনবো হিষ্ট্রির কোনো flat চেহারার প্রফেসারের নাম তোমরা 'চ্যাপ্টা চাটুয্যে' রেখেচ"!

"আমি কি আর রেখেচি, মশাই? কতকগুলো বখাটে ছেলে রেখেচে। আমি বাবা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমি চুপটি করে পেছনের বেঞ্চিতে বসে থাকি"।

"পেছনের বেঞ্চিতে কেন? তোমাদের সঙ্গে যে দু' চার জন মেয়ে পড়ে, তারা বুঝি ঐ পেছনের দিকেই বসে"?

"দূর, দূর, তা' কেন? তারা সব পুতুলটির মত সেজেগুজে সামনেকার বেঞ্চিতে বসে; নিজেদের ভেতর কি সব ফিসির ফিসির করে, আর হেসে কুট্‌পাট্‌ হয়। আমি ওদের দিকে ফিরেও তাকাইনে। আমার জন্যে হিমালয় অপেক্ষা করচে"।
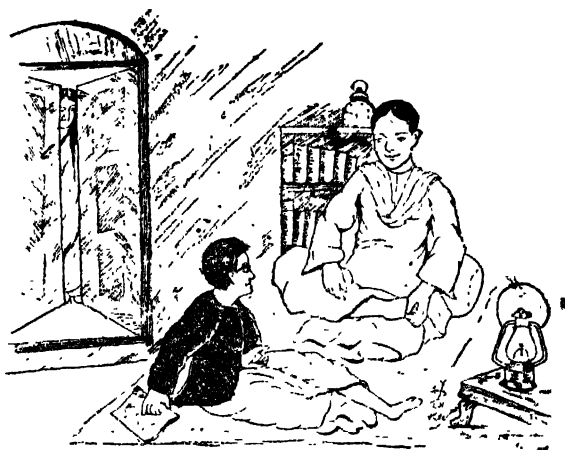
দশের মধ্যে কত পেতে পারি?

"ওরে বাস্‌রে! balaclava cap ট্যাপ্‌ কেনা হয়ে গেছে বুঝি? আহা, কৃষ্ণই যদি হিমালয়ে প্রস্থান করেন, তা' হলে

কানুপ্রিয়ার কি গতি হবে গো? ইস্, প্রোষিতভর্তৃকার যে কষ্ট! হে কৃষ্ণ, তোমার এই নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ত্যাগ কর!!"

"ঠাট্টা নয়, ঠাট্টা নয়, দেখবেন পরে।—যাক্, আমার লেখাটা ত আপনি শুনলেন; কেমন হয়েচে?"

"মন্দ নয়"।

"দশের মধ্যে কত পেতে পারি?"

অগ্রজের প্রশ্ন শুনিয়া দরজার অন্তরালে কানুপ্রিয়ার পেট ফাটিয়া হাসি আসিবার উপক্রম হইল। কোনো প্রকারে হাসি চাপিয়া, যেমন নিঃশব্দে সে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে সে নীচের তলায় পলায়ন করিল।

রন্ধনগৃহে তখন জননী ও পিতামহীতে মিলিয়া, থালাবাটী পূর্ণ করিয়া, অরুণকুমারের জন্য আহার্য্য বস্তু সাজাইতে ব্যস্ত। তিন লম্ফে সেখানে উপস্থিত হইয়া, উচ্চহাস্য করিয়া, কানু বলিয়া উঠিল—"ঐ শোনোগে যাও, 'দশের মধ্যে কত পেতে পারি' আরম্ভ হয়ে গেছে। বলেছিলাম কিনা তখন? গায় থুথু দেবার এখন কি?"

একখানা রজত নির্ম্মিত রেকাবের মধ্যস্থলে পোয়াটেক ওজনের বেশ বড় একটি রাজভোগ স্থাপন করিয়া, কানুর জননী মৃদুহাস্যে বলিলেন—"থাম্ পাগলী, থাম্; অত চেঁচাসনে। কৃষ্ণ গেছল বলেই ত জামাই এলো। নইলে এত খাবার সব নষ্ট হতো যে।

পূর্ব্ববৎ কলকণ্ঠে কানু উত্তর করিল—"নষ্ট হতো' না আরো কিছু! আমাদের পেট নেই ?"

আমাদের পেট নেই ?

কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া জননী শুদ্ধমাত্র বলিলেন—"রাক্ষুসী" !!

জহরের দুঃখ

ছোট্ট ছোট্ট ধব্ধবে পা দু'খানি,—যেন ননী ছানিয়া গড়া।

সবেমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে। খুট্‌খুট্, খুট্‌খুট্,—হেলিয়া দুলিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। পাঁচ পা যাইতে না যাইতে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়ে। আবার ওঠে, আবার সেইরূপ টলিয়া টলিয়া হাঁটে, আবার টাল সামলাইতে না পারিয়া যেখানে সেখানে ধুপ্‌ধাপ বসিয়া পড়ে।

একখানা বড়ঘরের পার্শ্বে একখানি ছোটঘর। আয়তনে ছোটঘরটি বড়ঘরের অর্দ্ধেক। দুই ঘরের মাঝখানের দেওয়ালে

পাশাপাশি দু'টি দরজা। দরজা বন্ধ থাকিলে ঘর দু'খানা সম্পূর্ণ পৃথক ; খোলা হইলে দু'টি ঘর প্রায় একই।

বর্ষণক্ষান্ত এক শ্রাবণের প্রভাতে ছোট ঘরটিতে কিঞ্চিৎ জনসমাগম হইল। ডাক্তার, ধাত্রী, সহকারিণী ধাত্রী, একটি মুচিজাতীয়া স্ত্রীলোক, আরও দুই এক জন। তারপর কিছুকাল 'গরম জল' 'গরম জল' রব, যন্ত্রপাতির ঝন্‌ঝনা, থাকিয়া থাকিয়া একটা প্রচ্ছন্ন কাত্‌রানির শব্দ। ব্যস্ততায়, উদ্বেগে, অশ্রুজলে ঘরখানা একেবারে থম্‌থমে হইয়া উঠিল।

ওঁয়া, ওঁয়া—

উদ্বেগ, অশ্রুজল কমিয়া আসিল ; কিন্তু ব্যস্ততা চলিল আরও কিছুকাল। অবশেষে, ধীরে ধীরে, শব্দমুখর ছোট ঘরটি নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। প্রয়োজনে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, প্রয়োজন ফুরাইতেই তাঁহারা একে একে প্রস্থান করিলেন। রহিল কেবল মুচি-স্ত্রীলোকটি এবং তাহার কর্ম্মকুশলতাজ্ঞাপক কোনও ধাতুময় কিম্বা মৃৎপাত্রের একটা ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ। দেখিতে দেখিতে তাহাও থামিয়া গিয়া ছোট ঘরটি সম্পূর্ণ নীরব হইল।

উলু দাও না গো তোমরা।

ক'বার দেব ?

অন্দরের আলো

ফুটফুটে খোকা হয়েচে যে,—পাঁচবার উলু দাও।

উলু উলু উলু
উলু উলু উলু
উলু উলু উলু

ক'বার হলো ?

তিন বার ; আরো দু'বার—

উলু উলু উলু
উলু উলু উলু

সোল্লাস উলুধ্বনিতে নবজাত শিশুর আগমনবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইল। উলুধ্বনি থামিতে না থামিতে পোঁ ওঁ করিয়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল। শঙ্খের নিঃস্বনে ও উলুধ্বনি গণনা করিয়া পাড়াপ্রতিবেশীরা বুঝিতে পারিল সহরের উপর পাঁচ খানা ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিক নটবর সিংহ মহাশয়ের আবার একটি দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিল।

কেহ কেহ সন্তুষ্ট হইলেও, অধিকাংশ প্রতিবেশীরা ইহাতে মনে মনে বিষম চটিয়া উঠিল—"দেখ কি অবিচার! মাস ফুরোতে না ফুরোতে যার ঘরে কর্‌করে হাজারো টাকা উঠে আসচে তার ঘরেই একেবারে ছেলের বন্যা। আমাদের মাসান্তে একশোটি টাকার সংস্থান নেই ; আর আমাদের এক এক

জনার ঘরে দেখগে যাও—খালি মেয়ে, মেয়ে, আর মেয়ে।" কেহ বলে,—"আরে, ফর্সেপ ডেলিবারি; আগে বাঁচুক ত। টেঁশে যেতে কতক্ষণ"? সহৃদয় প্রতিবেশীরা নানাপ্রকার মুখরোচক কথা বলিয়া, ইঙ্গিত করিয়া, গাত্রদাহ নিবারণ করিতে বিধিমতে কিম্বা অবিধিমতে চেষ্টা করে।

ছোটঘর ও বড়ঘরের মধ্যকার দরজা দু'টি এতক্ষণ বন্ধ ছিল; এইবার খোলা হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের দিকের জানালা কপাট সব বন্ধ।

তক্তপোষের উপর প্রসূতি শায়িতা। মুখখানি তাঁর অতি মাত্রায় পাণ্ডুর। যেন ঝড়ে খসিয়া পড়া একটি চীনা গোলাপ। বিধ্বস্ত,—কাগজের মত সাদা, রক্তরাগের লেশমাত্রহীন। পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি মঞ্জরী। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। শুদ্ধমাত্র মুখখানা দেখা যায়,—লাল টুক্‌টুকে; বসোরাই গোলাপের কুঁড়িটির মত!

খুট্‌খুট্, খুট্‌খুট্ করিয়া কোথা হইতে জহর আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই হেলিয়া দুলিয়া রাজহংসের মত তাহার গতি; কিন্তু মুখের ভাবটি ভীষণ প্রশ্নবোধক!

দু'টি ঘরের মধ্যকার দরজার নিকট আসিয়া জহর দাঁড়াইল। চৌকাঠের নীচে খানিকটা জায়গা বেদীর মত করিয়া বাঁধানো। সেই বেদীর উপর উঠিতে গিয়া হুড়্‌মুড়্ করিয়া সে পড়িয়া

গেল। একটু লাগিয়াছিল। কাঁদিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেই ছোট ঘর হইতেই জননী অবসন্ন ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"পড়ে নাই, পড়ে নাই, জহর পড়ে নাই ত;—লাফ দিয়েচে! ষাট্, ওঠো।"

লাফ দিয়েচে!
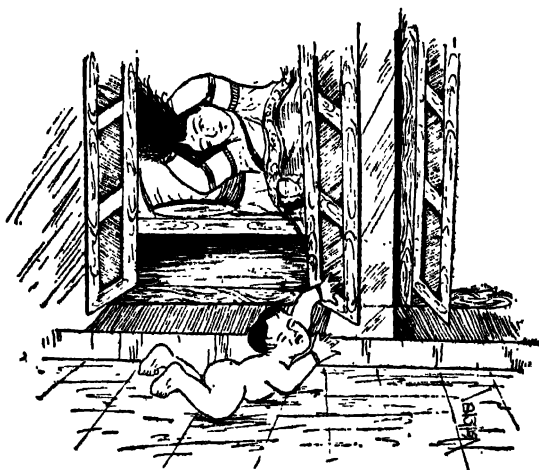
মস্তবড় দেড় বছরের ছেলে, সে নাকি আবার দুই ইঞ্চি উঁচু জায়গায় উঠিতে গিয়া এমন করিয়া পড়িয়া যাইতে পারে? ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক ও অপমানকর ব্যাপার আর কি

হইতে পারে, হ্যাঁগা? সেই জন্যই বুঝি জহরের কাঁদিয়া ফেলিবার আয়োজন? কিন্তু স্বয়ং জননীই যখন বলিতেছেন জহর পড়িয়া যায় নাই, শুধু মাত্র ইচ্ছা করিয়াই একটা "হাই-জাম্প" দিয়া ফেলিয়াছে, তখন ইজ্জৎ ত রক্ষাই হইল! আবার ক্রন্দন কেন?

জহর কাঁদিল না। দুই হাত উল্‌টাইয়া চোখ দুটি একটু রগ্‌ড়াইয়া লইল মাত্র। তাহার পর দরজার পাল্লা এইবার বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া, চৌকাঠের নীচেকার বেদীর উপব সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বেদীর উপর চড়িয়া ছোটঘরের তক্তপোষের উপরকার সকল প্রাণীকেই জহর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। ঐ যে তাহার মা শুইয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের উপরকার সুন্দর সাজানো-গোজানো বড ঘবটিতে না শুইয়া, এই দরজা-কপাট বন্ধ করা চোরকুঠরির ভিতরেই বা কেন, আর এমন অসময়েই বা কেন? মায়ের পাশে ওটাই বা কি বস্তু? কত প্রশ্ন, কত সন্দেহ যে মনে জাগে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহা ভাষায় যে প্রকাশ করিবে, সে পথও বন্ধ। সবে তার দুই চারিটি কথা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—অথচ রসনাগ্রে শত শত প্রশ্ন ভিড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

জহর তরলকণ্ঠে ডাকে—"মা"।

প্রসূতির মুখে কেমন একটা অপরাধিনীর ভাব ফুটিয়া ওঠে। অপরাধিনীর ভাব? হ্যাঁ, অপরাধিনীর ভাবই বটে। এমন ছেলে,—ভাল করিয়া হাঁটিতেও শিখে নাই; মুখে কথাও ফোটে নাই,—তার কত কথাই ত মনের কোণে আসিয়া উকি মারে। জহরের মাতৃ-সম্ভাষণের কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া জননী অবোধ শিশুটির পানে চাহিয়া থাকেন।

"মা"—

ছোট্ট ডাক। কিন্তু এমন টানিয়া টানিয়া, যেন কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, জহর মা বলিয়া ডাকে যে, জননী চমকাইয় উঠিয়া বলেন—

"বাবা"—

"মা"—

"আমার জহর,—আমার জহরৎ!"

শুধু এই? ঐ এক মাইল দূরে শুইয়া শুধু মাত্র একটু মৌখিক সোহাগ—আমার জহরৎ? কেন, উঠিয়া নিকটে আসিলে পা দুইখানা কি তাঁর ক্ষয় হইয়া যাইবে?

রুদ্ধ অভিমানে জহরের চক্ষুদুটি ছল্ ছল্ করিয়া ওঠে।

পূর্ব্বে, মা বলিয়া ডাকিলে, জননী যেখানেই থাকুন না কেন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া চুমায় চুমায় অস্থির

করিয়া তুলিতেন। সে তাহার চম্পককলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে জননীর মুখ ঠেলিয়া সরাইয়া দিত। কিন্তু এমন সুখের দিন ছিল তখন যে জননীর মুখ সবলে ঠেলিয়া দিলেই কি আর তাঁহার মুখ বিমুখ হইত? অসম্ভব। মুখখানি তাঁর ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহার অধরের নিকট আসিয়া পড়িত। আবার তাহার গণ্ডস্থল আক্রমণ করিতে চাহিত। সে সব দিনেব কথা ভাবিতেও পুলকে শরীর কণ্টকিত হইয়া ওঠে। আর আজ একি বৈষম্য! তিন তিন বার সে মা বলিয়া ডাকিয়াছে; কিন্তু একটু সাড়া ব্যতীত কিছুই সে আজ পাইল না কেন? চোখ দুটি যদি বেদনায় ছল ছল করিয়া ওঠে, তাহা হইলে চোখের আর অপরাধ কোথায়?

একবার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্য উচ্ছসিত কণ্ঠে জহুর ডাকে—

"মা"—

সেই পূর্ব্বেকার মত একটানা স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর।—যেন দোয়েল ডাকে, কিংবা কোকিল ডাকে। এমন সুধামাখা কণ্ঠস্বর বুঝি আর হয় না।

পুত্রের মনোগত অভিপ্রায় জননী প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া, ব্যথায় বুকের ভিতরটা তাঁহার টন্ টন্ করিয়া ওঠে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে। কিন্তু উপায় কি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—"জহরৎ আমার, মাণিক আমার,—এই যে আমি রয়েচি"।

"ই-যে"—

"হ্যাঁ এই যে তুমি বাবা ; আমি দেখেচি তোমাকে ধন ; কিন্তু তোমাকে যে এখন কোলে নেবার উপায় নেই।"

উপায় যে নাই তাহা জহরও কিছু কিছু বুঝিতে পারে। কেহ যেন তাহার মনের ভিতব থাকিয়া চুপি চুপি সে কথা তাহাকে বলিয়া দেয়।

তবু মন ত প্রবোধ মানে না। ছোট্ট ছোট্ট, ননী ছানিয়া গড়া পা দু'খানি চৌকাঠ ডিঙাইয়া যাইতে চায়।

একটি পা উঠিযাছে ; এখনই হয় ত উহা ছোটঘরে আসিয়া পড়িবে, এমন সময় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া জহরের মাসীমা খপ্ করিয়া জহরকে কোলে তুলিয়া লইলেন। জহরের আশা ত পূর্ণ হইল না। দু'টি ঘরের মধ্যে ব্যবধান একটি চৌকাঠ মাত্র—হিমালয় পর্ব্বতও নহে, গঙ্গা নদীও নহে, দণ্ডক অরণ্যও নহে ;—শুধু একখণ্ড কাষ্ঠ। সেই সামান্য অন্তরায় লঙ্ঘন করিয়া সে মায়ের কাছে যাইবে,—মাকে স্পর্শ করিবে, মায়ের বুকে নিজকে ঢালিয়া দিবে। শুদ্ধ মাত্র চোখের দেখাতেই কি প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় ?—বল না তোমরা!

জহরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। প্রাণের যে বিপুল আকাঙ্ক্ষা,

যে তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া সে চৌকাঠ ডিঙাইয়া যাইতেছিল, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই ব্যকুলতা এইরূপে প্রতিহত হইয়া কোমল বক্ষটিকে তার একেবারে দলিয়া মুচড়াইয়া শেষ করিয়া দিয়া গেল। জহর কাঁদিল।

সূতিকাগৃহে প্রসূতির পাংশু মুখখানা যেন পাংশুতর হইয়া ওঠে। একটি প্রবোধবাণী, একটি সান্ত্বনার বাক্যও মুখে জোটে না। নীরব ব্যথায়, অপলকনেত্রে পুত্রের অশ্রুপ্লুত মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। হায়রে নাড়ীর টান!

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া…

কাজেই, এটাকেও বুকে আঁকড়াইয়া সামলাইতে হয়।

দেখিয়া, জহর কাঁদিয়া আকুল। মনে করে, এটা আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া এমন করিয়া তাহার মায়ের বুক জুড়িয়া বসিল। ভাবে, আর তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া বিগলিত অশ্রুধারা হু হু করিয়া নামিয়া আসে।

মাসীমা জহরকে নানা প্রকারে ভুলাইতে চেষ্টা করেন।—"বাবা আমার, কাদে না; এই যে তোমার মা রয়েচে। আর ও কে, চেয়ে দেখ। ও কে হয় জানো? ভাই হয়, ছোট্ট ভাই। দাদা, দাদা,—জহর আমার দাদামণি হয় যে;—কাঁদে না চুপ কর,—আমার ধন।"

চুম্ চুম্ করিয়া বহু চুম্বন জহরের গণ্ডে আসিয়া পড়ে।

আদর পাইয়া জহর সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যায়। অশ্রুধারা শুষ্ক হইয়া ওঠে। মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে চাহে। হাসি নয় ঠিক, হাসির ছায়া; ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।—মেঘের কোলে পথভ্রান্ত রবিকরের চকিত বিকাশের মত।

সস্নেহে অঞ্চলে চোখ মুছাইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, মাসীমা জহরকে বড়ঘরের তক্তপোষের উপর বসাইয়া দেন। বলেন,—"এই খানটায় লক্ষ্মীটি হয়ে বসো। ওঘরে যেও না যেন বাদুমণি, বুঝ্‌লে? ওঘরে এখন যেতে নেই; অশুদ্ধ ঘর ওটা। এইখানে বসে এই বিস্কুট দু'খানা খাও, কেমন? আমি কাজ সেরে এসে আবার তোমাকে কোলে নেব,—আরও একটিন ভর্ত্তি বিস্কুট দেব!" বলিয়া, মাসীমা কক্ষান্তরে চলিয়া যান।

জহর বসিয়া বসিয়া বিস্কুট খাইতে থাকে—কুটুর, কুটুর, কুটুর।

দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বেলা শেষে, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া, জহরের মাসীমা সবে আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছেন। জলের ঘটীটি বামহস্তে লইয়া তিনি আচমন করিতেছেন, এমন সময় সূতিকাগৃহ হইতে একটা আকুল আহ্বান শুনিতে পাইলেন—"দিদি, দিদি!"

এক নিমেষে হস্তমুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া, অঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি বড়ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কি লা, কি হয়েচে" ?

"আমার জহর কই" ?

"ওঃ, এই ? এমন করে ডেকেচিস যে পেটের পিলে অবধি চমকে উঠেছিল! না জানি আবার কি হ'ল ভেবে দৌড়ে এসেচি। কেন, জহর ত এই খানেই খেলা করছিল। তুই জানিসনে কখন এঘর থেকে বেরিয়ে গেল" ?

"না, আমি ত কিছুই জানিনে। খেলা করছিল ত অনেক আগে। এখান থেকে ওঘরের সবটা কি আর দেখা যায় ?—থেকে থেকে অস্পষ্ট খুট্ খুট্ একটা শব্দ মাত্র শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাবলুম জহরই বুঝি খেলা করচে। তারপর কখন যে আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, জানিনে। জেগে দেখি, ওঘরটা যেন খাঁ খাঁ করচে; বাড়িশুদ্ধ কারো সাড়াশব্দ নেই।—আর এটা পেট থেকে পড়ে অবধি কী যে লম্বা ঘুম দিচ্চে! ভালো লাগে না আমার।—এই, এই, ওঠ্ না।"

"উঠবে এখন; এমন করে ধাক্কা দিস্‌নে। এ-ঘুম খুব ভালো। সকাল সকাল ছেলেরা বেড়ে ওঠে যদি এমন করে ঘুমোয়"।

"ঘুমোক তবে। তুমি দেখ জহর কোথায়। জহর, জহর;

—কোথায় গেল ছেলে?—ওর জন্যে বুকের ভেতরটা কেমন যে করে আমার। এটা হয়েচে বটে, কিন্তু জহরটার জন্যে মনে আমার এক তিল সুখ নেই। কোথা থাকে, কোথা যায়,—যে আমাদের নেড়া ছাদ, সেখান থেকেই পড়ে, কি আরশোলাই চিবোয়!—দেখ তুমি দিদি জহর কোথা আছে।”

“ভাবিসনে অত; জহর ঠিক ওর ছোট মাসীমার কাছে আছে!”

“একবার দেখেই এস না”।

কিন্তু দেখিয়া আসিবার কোনই প্রয়োজন হইল না। খুট্‌খুট্‌ খুটুখুটু করিয়া জহর আসিয়া উপস্থিত। একেবারে দিগম্বর অবস্থা। গলায় সোনার বিছেহার, প্রকোষ্ঠে বলয়, কোমরে গোট। মস্তকের রেশমনিন্দিত কেশরাশি সম্মুখের দিকে ঝুঁটি করিয়া বাধা। ঝুঁটিতে আবার একটি সোনার ঝুমকো আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুস্থ, সবল শিশুটির বালকৃষ্ণ-বেশ মানাইয়াছে সুন্দর। দেখিয়া, জননী ও মাসীমা সতৃষ্ণনয়নে জহরের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন।

হাত বাড়াইয়া জহরকে কোলে টানিয়া লইয়া মাসীমা বলিলেন—

“বলি, ছিলে কোথা এতক্ষণ? মহাশয়ের কোথা হতে আগমন হল”?

জহরের দুঃখ

জহর হাসল। হাসিয়া, হাঁ করিয়া মুখের ভিতরটা দেখাইল। তাহার পর আবার মুখ বন্ধ।
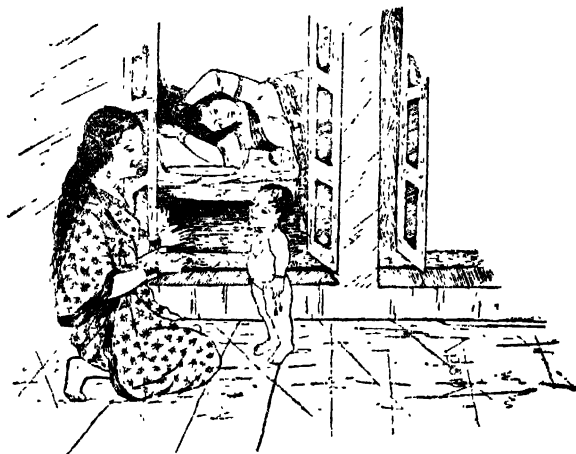
কোথা হতে আগমন হল ?

ব্যস্ত হইয়া মাসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি খেয়েছিস্, দেখি কি খেয়েছিস্ ?"—বলিয়া, মুখের ভিতর অঙ্গুলি চালাইয়া একরাশি নানা আকারের চর্বিত কয়লার টুকরা বাহির করিয়া ফেলিলেন —"আ রামোঃ। পাথর-কয়লা চিবিয়ে দন্তধাবন করা হয়েছে বুঝি ?—এই তোমার বুদ্ধি ? ফেল্, ফেল্,—যা আছে মুখে সব ফেল্"।

আর ফেল্! অর্দ্ধচর্ব্বিত পাথুরে কয়লা লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া ততক্ষণে জহরের পেটে চলিয়া গিয়াছে।

মাসীমা তর্জ্জন করিয়া বলেন—"রাজ্যের অখাদ্যের ওপর তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, কেমন? আর খেও না কক্ষনো"।

জননী কহিলেন—"কয়লা খেয়েচে, এই রক্ষে! কেন্নুই কি আরশোলা যে মুখে পুরে দেয়নি এটাই সুবুদ্ধি বলতে হবে।—কেন যে ওর এ সমস্ত অখাদ্য-কুখাদ্যের ওপর দৃষ্টি, বুঝিনে"।

"হয়রে হয়, ওরকম ঢের ছেলেপুলের হয়। হবে না, পাঁচ ছয় মাসেরটি হতে না হতেই মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ওর বন্ধ হয়েচে যে"।

লজ্জায় জননীর মুখে রক্তের ছোপ লাগিতে চায়। কিন্তু রক্ত কোথায় শরীরে যে মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিবে? রাঙা আর হয় না; ঐ কেমন একরকম হইয়া ওঠে।

জহরের মা কথাটা উল্টাইয়া অন্য কথা পাড়েন—

"দিদি"—

"কি লা"?

"হাটখোলায় খবর যায়নি"?

"ছেলে হবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাঠানো হয়েচে"।

"কারো সঙ্গে দেখা নেই যে! এত কষ্ট পেলাম, যদি মরেই যেতাম?—আজ বোধ হচ্চে আসবে না"।

"কি জানি; আসা ত উচিত ছিল এতক্ষণ। সন্ধ্যেবেলা হয় ত আসবে।"

জহর তাহার মাসীমার বক্ষের কাপড় ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই আর কাপড়টা স্থানচ্যুত করিতে না পারিয়া, তাঁহার কাঁধের কাছে কুট্ করিয়া কামড়াইয়া দিল। মাসীমা উহু উহু করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখেচ ছেলের নষ্টামো? কাপড় ধরে টানাটানি করচে, আমিও শক্ত করে চেপে রয়েচি; না পেরে শেষে দিলে কামড়ে"।

প্রসূতির মুখখানা আবার অন্ধকার হইয়া আসে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন—"দাও দিদি, ওকে একটু দাও; চাটুক একটু। জহরের দুধ খাবার সাধ ত মেটে নি।"

"দূর, আমার ওতে কিছু যেন আছে!"

"থাক্ বা নাই থাক্, দাও ওকে একটু চাটতে। কিছু না পেলে ও আপনি ছেড়ে দেবে"।

"আমি পারবো না বাবা। যে ধার ওর দাঁতে; কিছু না পেলে, শেষে দেবে তখন কামড়ে!"

জননীর মুখে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া ওঠে।

বলেন—'কামড়াবে না, কামড়াবে না; আমার মাথার দিব্যি, তুমি দিয়েই দেখ। মা হয়ে আমি ওকে কিছুই দিতে পারলুম না। ফুড্ আর গরুর দুধ খেয়েই ও বড় হ'ল।—এখনও ঘুমের

ঘোরে ও মাইটানার স্বপ্ন দেখে।—চোঁ চোঁ চোঁ—কেমন যে করে ওর ঠোঁট দু'খানা, দেখো তুমি এক দিন রাত্রিবেলা।

সন্তানহীনা মাসীমার বক্ষে স্নেহরসের প্রস্রবণ উদ্দাম হইয়া ওঠে। তক্তপোষে বসিয়া পড়িয়া, জহরকে অঙ্কে শোয়াইয়া, তিনি কোমল কণ্ঠে ডাকেন—"জহর"—

"ই—যে"—

বক্ষের অঞ্চল ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। জহরের মস্তক ঈষৎ হেলিয়া পড়ে। শেষে তাহার গোটা মাথাটাই মাসীমার অঞ্চলের নীচে অদৃশ্য হয়!

প্রসূতির চোখ দু'টি শান্তিতে মুদিয়া আসে।

সমাপ্ত